একুশ শতাব্দী

৮

প্রসঙ্গ ঃ আবৃত্তি

আবৃত্তি—কিছু ভাবনা ☐ শিল্প ও সংশয়

অবৃত্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকবিতা ☐ আবৃত্তি আলেখ্য

স্মরণের আবরণে

শম্ভু মিত্র

গল্প / কবিতা / বইপত্র / চিঠিপত্র

A WELL WISHER

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ২ ☐ সংখ্যা ১-২ ☐ ১৯৯৭

(জানুয়ারী—জুন)

সম্পাদক ☐ সাগর বিশ্বাস

সহযোগী সম্পাদক ☐ সুমিত্রা দস্তচৌধুরী

উপদেষ্টা ☐ দিলীপ চক্রবর্তী অমিতাভ চৌধুরী

যোগাযোগ ☐ এন ২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১

Evergreen Enterprise

1/1 Haladhar Bardhan Lane,
Calcutta 700012

শিশু শিক্ষার বিশ্বস্ত বিদ্যালয়

নব শিশু নিকেতন

বিশরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
প্রধান শিক্ষক : বাদলচন্দ্র গুড়িয়া

ASHOK ENTERPRISE

Timber Merchants, importers

& general order suppliers

Rail gate No. 6, Bisharpara
North 24 Parganas

একুশ শতাব্দী

(মাঘ ১৪০৩—আষাঢ় ১৪০৪)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়—৭

প্রবন্ধ / নিবন্ধ

আবৃত্তি : এই সময়ের কিছু ভাবনা ☐ প্রদীপ ঘোষ—৯

আবৃত্তি : শিল্প ও সংশয় ☐ সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫

প্রসঙ্গ আবৃত্তি—২৩

আবৃত্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্র কবিতা ☐ শিখা বিশ্বাস—২৫

আবৃত্তি আলেখ্য—'বলাকা' ☐ সাগর বিশ্বাস—২৬

গল্প

পদ্য ছাওয়া ☐ বিষ্ণু বিশ্বাস ৩৯

খুঁজে ফেরা ☐ সুস্মিতা রায় ৪৯

কবিতা

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা / মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৫২ ☐ তত্রাপদ আচার্য ৫৪ ☐ যশোধরা রায়চৌধুরী ৫৫ ☐ সমর্পণ মুখোপাধ্যায় ৫৫ ☐ অজয় নাগ ৫৫ ☐ অনিন্দ্য রায় ৫৬ ☐ পার্থ বসু ৫৭ ☐ অরিজিৎ দত্ত ৫৭ ☐ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ৫৮ ☐ তাপস রায় ৫৯ ☐ মৃণাল দত্ত ৫৯ ☐ মানিক বৈদ্য ৬০ ☐ সুমিত্রা দত্তচৌধুরী ৬১ ☐ অরিন্দম দত্ত ৬১ ☐ রোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২ ☐ দেবাশিস চাকী ৬৩ ☐ অনিমা মিত্র ৬৩ ☐ মিহির ঘরামি ৬৪ ☐

স্মরণের আবরণে

শম্ভু মিত্র ☐ কিশলয় সেন ৬৫

বইপত্র

হারবার্ট / অরবিন্দ পুরকাইত ৬৭ ☐ সাদা পাতায় দাগ কেটেছি / বাক নদী মায়া জল / অনিমা মিত্র ৭১ ☐ হৃদপিন্ড শব্দ খোলে / ফুল কিনারা / অমলেন্দু ঘোষ ৭৩ ☐ ছড়াছড়ি কলকাতা / যশোধরা রায়চৌধুরী ৭৬

চিঠিপত্র ৭৮

প্রচ্ছদ : এষা বিশ্বাস

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের

জনকল্যাণ প্রকল্প

- ☐ দাতব্য চিকিৎসালয় (অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি)
- ☐ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ☐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- ☐ কুটির শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থান
- ☐ প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণ

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ

দক্ষিণ কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর

উত্তর ২৪ পরগণা

প্রতিষ্ঠাতা : ঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী

Space donated by

A Well Wisher

R. krishnan

সময় ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তার ফসল স্বাধীন বিশ্বাস-এর

গল্পসংকলন

কলকাতা ও তার আশেপাশের দূরত্ব

সাহিত্য বিহার—এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ॥ বড়দিদি ৮·০০ ॥ পরিণীতা ৮·০০ ॥ চন্দ্রনাথ ৯·০০ ॥ পল্লী-সমাজ ১৩·০০ ॥ বিরাজ বৌ ১২·০০ অরক্ষণীয়া ৮·০০ ॥ বামুনের মেয়ে ১০·০০ ॥ গৃহদাহ ১৮·০০ ॥ গল্পসংকলন ১৮·০০ ॥ নিষ্কৃতি ৮·০০ ॥ স্বামী ৮·০০ ॥ পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ॥ নববিধান ৮·০০ ॥ বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ॥ দেনা-পাওনা ১৫·০০ ॥ রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ॥ কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ॥ মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ॥ দত্তা ১৫·০০ ॥ চরিত্রহীন ২০·০০ ॥ পথের দাবী ১৮·০০ ॥ কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ॥ প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮·০০ ॥ নাটক—ষোড়শী ১০·০০ ॥ বিজয়া ১০·০০ ॥ রমা ৯·০০ ॥

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ॥ পথের দাবী ২০·০০ ॥ চরিত্রহীন ২২·০০ দেনা পাওনা ১৮·০০ ॥ শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ॥

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ॥ সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ॥

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন : ৩৫০-৯৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

একুশ শতাব্দী

- তিনমাস অন্তর বেরোয়
  (জানুয়ারী—মার্চ, এপ্রিল—জুন, জুলাই—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—ডিসেম্বর)।
- গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক তিরিশ টাকা। ডাকযোগে পঞ্চাশ টাকা।
- লেখকেরা অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবেন। সঙ্গে পুরো ঠিকানা দেবেন।

কলকাতায় 'একুশ শতাব্দী' পাবেন

- পাতিরাম ☐ কলেজ স্ট্রিট
- লিটল ম্যাগাজিন স্টল, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
- ইমা বুক সেন্টার, বিবাদী বাগ
  (টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকে)
- ডি. পি. দত্ত
  ১০ গভর্নমেন্ট প্লেস (ইস্ট)
  এজরা ম্যানসন (তিনতলা)

আমাদের মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি

বিপ্লব চৌধুরী FHC / 225 [NTPC / FSTPP]
নবারুণ, মুর্শিদাবাদ

● সম্পাদকীয়

'জন্মিলে মরিতে হবে' এ আর নতুন কথা কি ? মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কোন কোন মৃত্যু বড় নাড়া দিয়ে যায় আমাদের। কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সমাজকে সমৃদ্ধ করেন, সভ্যতাকে এগিয়ে নেন। সমকাল হয়তো তাঁদের সকলের মূল্যায়ণে সমর্থ হয়না, হয়তো বা অবমূল্যায়ণও করে কোথাও কোথাও। তথাপি সেইসব মানুষ ব্যতিরেকে এ পৃথিবীর জীবনপ্রবাহ বুঝি কল্পনাও করা যায় না। সমাজে কেউ গান গায়না, ছবি আঁকেনা, সাহিত্য করেনা, শিল্প সংস্কৃতি ভালবাসেনা—এমন কোন চিত্রকল্প চিন্তা করা যায় ? শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি আছে বলেই তো আমরা প্রকৃতিকে চিনতে পারি; তার অভ্যন্তরে আপন অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। তাই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা যাঁরা করেন তারা যে শুধু মানুষের আত্মিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ঘটান তাই নয়, সমাজেরও ভারসাম্য রক্ষা করেন। মানুষের মনন ও চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের ভারসাম্য রক্ষাকারী সেই মানুষদের মৃত্যু স্বভাবতই আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। আর সে মৃত্যু যদি ধ্বস নামার মতো নেমে আসে, আমরা বিচলিত না হয়ে পারিনা।

এমনই মৃত্যুর ধ্বস দেখলাম আমরা একবছর ধরে। গতবছর জুন মাস থেকে এ বছর জুনের মধ্যে আমাদের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য জগত থেকে ঝরে গেলেন, নীলিমা সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, রবি ঘোষ, নির্মল ঘোষ, শম্ভু মিত্র, শান্তনু বসু, বিমল বসু, সুব্রত নন্দী, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, শ্যামাকান্ত দাস, নীলিমা দাস, অজু রাহা, ধরণী ঘোষ, শ্যামল চক্রবর্তী, মিহির সেন, বাসু ভট্টাচার্য, প্রভাস ফাদিকার, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ মুখোপাধ্যায়, শংকর গুপ্ত, মিহির ঘরামী প্রমুখ। জেলা থেকে আসা খবরে দেখা যাচ্ছে একই সময় যুদ্ধে মারা গেছেন কোচবিহারের মানিক দত্ত ও নারায়ন ভট্টাচার্য, বীরভূমের বাবলা হাজরা, হুগলির তারকনাথ শীল। এই মৃত্যু মিছিল, সন্দেহ নেই, আমাদের সংস্কৃতি জগতের যে ক্ষতিসাধন করে গেল তা সহজে পূরণ হতে পারেনা। স্বভাবতই আমরা বিচলিত, শোকাহত।

গত ১৯শে মে আমরা স্মরণ করলাম বাঙলা ভাষার স্বাধিকারের দাবিতে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন শিলচরে ১৯৬১ সালের ওইদিন। স্মরণ করলাম বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের (ঢাকা) শহীদদের। 'একুশ শতাব্দী' আয়োজিত এই স্মরণ সন্ধ্যা যাঁদের উষ্ণ সান্নিধ্যে সদর্থক হয়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাবিত্রী ভট্টাচার্য, অনিন্দ্যপদ ভট্টাচার্য, (করিমগঞ্জ, আসাম), অজয় সরকার, আবৃত্তিকার সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা বিশ্বাস, সঙ্গীতশিল্পী মুনমুন দস্তরায়, অধ্যাপক ও সাহিত্যিক তারাপদ আচার্য, রুমা বসু, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অজিতা চৌধুরী ত্রিপুরা), অমলেন্দু বিশ্বাস, অভিজিৎ পাল চৌধুরী, অনিমা মিত্র, সমর্পণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সভায় দুরদর্শনে বিকৃত বাঙলা পরিবেশনার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আজ যখন বাঙলা ভাষা ও বর্ণমালা আর একবার বিপন্ন হতে বসেছে তখন এ ধরণের আলোচনা সভা ব্যাপকতর হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকূলতাকে ধ্রুব সত্য মেনেও 'একুশ শতাব্দী' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। লেখক পাঠক বিজ্ঞাপন দাতা ও সহমর্মী সবাইকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। কিছু অনিবার্য বিলম্বহেতু এ সংখ্যা যুগ্মসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো। ক্ষুদ্র পত্রিকা জগতের সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী বৃহতের কথা বাদ দিলে সমস্ত ক্ষীণতনু কৃশকায় কাগজগুলির প্রাথমিক সমস্যা অর্থের একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অর্থের সংকট থাকলে প্রচারেরও সমস্যা থাকে। আমাদের গুণগ্রাহীদের প্রতি তাই অনুরোধ—যদি যথার্থই মনে করেন 'একুশ শতাব্দী'র মননে ও নির্মাণে ভাল কিছু আছে. তবে আপনার পরিপার্শ্বে আর পঁচজনকে আপনিই জানান। সহৃদয় পাঠকদের বলি নিয়মিত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে। জেলাস্তরের বন্ধুদের প্রতিও একই আবেদন। মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়াতে আমাদের সাহায্য করুন।

১৯৯৭-৯৮ বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির দুই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের জন্ম শতবর্ষ। একজন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন তুলসী লাহিড়ী। 'একুশ শতাব্দী' তাঁদের প্রতি জানায় শতবর্ষের সশ্রদ্ধ প্রণাম। □

প্রবন্ধ

আবৃত্তি ঃ এই সময়ের কিছু ভাবনা

প্রদীপ ঘোষ

শিল্পের একটা শাশ্বত আনন্দময় দিক আছে যা অন্তর্লীন অমলিন অফুরাণ প্রেরণার মত। সেই সঙ্গে আছে তাৎক্ষণিক বিনোদনও যার আবেদন অনেকটাই স্নায়ু আর ইন্দ্রিয়ের কাছে। জীবনে কম বেশি এ দুয়েরই প্রয়োজন আছে। তবে কার কাছে কোনটা কতটা তা নিশ্চয়ই আপেক্ষিক এবং ব্যক্তিগত অভিরুচি নির্ভর। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ—এই সরল সত্য মেনে নিলেও রুচির প্রশ্নে একটা সংকটকে পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় নেই। সমস্যাটা শ্রেয় প্রেয়র? হয়ত বা। কিন্তু কী করেই বা তার জাত চিনব! এই বিজ্ঞাপন, আর বিপণনের যুগে! রঙিন মোড়কের আড়ালে লুকিয়ে আছে আসল বস্তু। অনায়াসে তাকে পাওয়া কঠিন। সুতরাং সহজে যা পাওয়া যায় সহজেই তাকে স্বীকার করে নিলে সাময়িক তৃপ্তি প্রাপ্তির পাত্র ভরে ওঠে। যাঁরা শিল্পের এই বহিরঙ্গের সুষমায় সৌকর্যে বিভ্রান্ত হন না তাঁদের কষ্টই অপরিসীম।

মনে পড়ছে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি সেবার সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। অনাড়ম্বর আপোষহীন মানুষ। তখন তাঁরই সম্বর্ধনার ধুম পড়েছে নানা আসরে। এমনি এক অনুষ্ঠানে অনেক কবি শিল্পী আবৃত্তিকার, অভিনয় জগতেরও কেউ কেউ। তাঁকে নিয়ে যাবার আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ফেরার সময় কোনও ব্যবস্থা নেই। অগত্যা সস্ত্রীক কবির সঙ্গী হয়ে আমরা ফুল, মানপত্রের 'বোঝা' নিয়ে এগিয়ে গেলাম একটা ট্যাক্সির খোঁজে। কবি বললেন, না না এস্-পনেরোতেই যাব। বাস পেলাম এবং আশ্চর্য—বসার জায়গাও। বসার পরই আচমকা বললেন তিনি তাঁর নিজস্ব পূর্ব বঙ্গীয় ভাষা ও উচ্চারণে—"আইচ্ছা, আমারে যে পুরস্কার দিসে তা তো কবি হিসাবেই দিসে?" বিস্ময়ে বললাম, 'হ্যাঁ কিন্তু—' "তাইলে? আমার কবিতাগুলা তো বিশেষ কেউ পড়লো না, স্লোগানগুলি পড়লো।" উত্তর দিতে পারি নি। কেননা, এ প্রশ্ন তো কখনও কখনও আমারো। আমিও

খুঁজছি এর যথার্থ উত্তর। অনুষ্ঠানে, আসরে যাই। শ্রোতা দর্শকের করতালি ধন্য অনুষ্ঠান শুনে বা দেখে দিনে দিনে প্রশ্ন যেন আরও জটিল হয়ে উঠছে।— তাহ'লে, তাঁর নিজস্ব পোষাকে তাঁকেও বুঝি আজ আর মানাচ্ছে না! তাই তাঁর গান শুনতে হচ্ছে আলাপ বিস্তার তান সহযোগে। রবীন্দ্রনাথকেও আধুনিকতার নামে যুগোপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা। আর সেই গান আর গায়কেরই বাজার। দর আর কদর। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের অন্তর্গত একান্ত কবিতাও উচ্চকিত স্বরক্ষেপণে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করছে। কোনও না কোনও প্রচার মাধ্যমের দৌলতে জনপরিচিতিকে কাজে লাগাচ্ছেন শিল্পী। সেই নিরিখে নির্ধারিত হচ্ছে তার সাম্মানিক দক্ষিণা। প্রচারের ভূমিকা এখন গুরুত্বপূর্ণ খুবই। সাধনের চেয়ে প্রসাধনের। সংস্কৃতির সমস্ত ধারার ক্ষেত্রেই এটা অল্পবিস্তর সত্য এবং বর্তমান বাস্তব। এবং তা শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় সর্বত্র একই অভিজ্ঞতা। এখন এমনই সময়। কবিতার কথাই যদি বলি এবং সংশ্লিষ্ট আবৃত্তিশিল্পের কথা, তবে অনেক সময়ই মনে হয় শিল্প বুঝি বা অন্দরমহল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে বিশেষ চর্চিত প্রকরণ-প্রকাশ নিয়ে চটকদার প্রচার-প্রচ্ছদে। সমাহিত শিল্পরূপ বুঝি সমারোহে সমর্পিত।

তাহলে কোথায় যাব? কোথায় পাব সেই শিল্পকে তার অপরিমেয় বৈভবে যা আমাকে সংকটে দেবে সাহস, আনন্দে অমৃত আশ্বাস, দৈন্য দুর্দিনে শুশ্রূষা, বিপর্যয়ে সাহচর্য? আমি যে তার আশ্রয় চাই। তাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাই সদর্থক জীবনে। এখন সময় যেন অনুকূল নয় — প্রায় সঙ্গীহীন স্বপ্ন দেখা! রাত্রি গভীরে নিজেকেই নিরুপায় জিজ্ঞাসা করি। এবং উত্তরও পেয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থহীন। এই শিল্পের বসবাস আমারই অন্তর্লোকে আমারই জীবনযাপনকে জড়িয়ে। শিল্প আমাকে সংস্কৃত করে, পরিশীলিত করে ব্যক্তি স্তরে। সম্মিলিত উদ্‌যাপন হতে পারে তার অবশ্যই। কিন্তু উপলব্ধির সূচনা ব্যক্তিতেই। যেমন করে প্রথমে একটি প্রদীপ জ্বালতে হয়, তারপর আরেকটা তার থেকে আরেকটা এমনি ভাবে একে একে অনেক—অনেক—জ্যোতি থেকে জ্যোতি—অবশেষে আলয়ের সামগ্রিক জ্যোতির্ময় উদ্ভাস। তখন আর প্রথম প্রদীপটির কথা মনে পড়ে না। আলোর আলোকময় প্রকাশেই সকলে সম্মোহিত। শিল্পের এই ক্রমবিকাশ আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। আমি তাকে উত্তরণ বলে মানি— এ পথেই তার বিবর্তন—ক্রমমুক্তি। এটা নিঃসন্দেহে সময়সাপেক্ষ। জীবনানন্দর ভাষায় সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। তবু শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত

সূর্যোদয়ের প্রার্থনা থেকে কখনই সরে আসতে চাই না। আবৃত্তি তাই আমার কাছে নিছক বিনোদনধর্মী এক ভঙ্গুর স্বল্পায়ু প্রয়োগশিল্প নয়। আবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে কাব্যের সাহিত্যের শিল্পের ধারাবাহিকতা তারই প্রাসঙ্গিক আরেক রূপ আবৃত্তি। জীবনের, সমাজের, পরিপার্শ্বের যুগযুগান্তরের অনুভব আর অভিজ্ঞতার সমন্বিত আরেক শিল্পরূপ আবৃত্তি। এই অভিধায় শিল্পের দাবিতে তার গুরুত্ব হয়ত বা সাম্প্রতিক। কিন্তু শিল্পের সামগ্রিক প্রবহমানতার সঙ্গে তার নিবিড় সখ্যে কোনও ছন্দপতন নেই। সময়ের সীমাকে তা বিস্তৃত করতে পারে—এক চাঁদোয়ার নিচে বর্তমানের সঙ্গে একটানা মেলাতে পারে অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। এখানেই ভরসা পাই। নিজের মধ্যেই বস্তুত আবিষ্কার করতে হবে শিল্পের সাধনপীঠ। জনরুচির সঙ্গে নিঃশর্ত সমঝোতা করে নয়। জনজীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজস্ব ভাবনা আর অনুভব মিলিয়ে মননে অনুশীলনে যে আবৃত্তিশিল্পের স্রষ্টা আবৃত্তিকার, তা তিনিই আবার ফিরিয়ে দেবেন জনসাধারণকে, সমাজকে। কখনও নিতান্ত ব্যক্তিগত, কখনও সমষ্টিগত আবেদনে। শিল্প জীবন বহির্ভূত নয়—তা জীবন থেকেই নেওয়া আবার জীবনকেই ফিরিয়ে দেওয়া—নব নব রূপে রসে ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যে। এই ফিরিয়ে দেওয়াই হরেকরকম। নানা প্রলেপে প্রচারে তার নিজস্ব রূপটি অনেক সময় ঢাকা পড়ে যায়। ওপরের খোলসটা খসে গেলে কখনও দেখা যায় তার ভেতরের শাঁসটুকু শুকিয়ে গেছে—অন্তঃসারশূন্য। এই শিল্প অবকাশযাপনের সাময়িক সঙ্গী হতে পারে। কিন্তু জীবনের পরমনির্ভর বন্ধু হতে পারে না।

এই সত্যকে আমরা নানাভাবে বুঝি নানা বয়সে, অল্প বয়সে সীমিত অভিজ্ঞতায় যা সাফল্য বলে মনে করি পরে তা অনেকসময়ই প্রগলভতা বলে মনে হয়। তাই মানুষে মানুষে শুধু রুচির প্রভেদই নেই, সময়ান্তরে রুচির বদলও ঘটে।

স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মমর্যাদাবোধ না থাকলে কেউ শিল্পী হয় না। খ্যাতি প্রতিপত্তির সঙ্গেও এর অনিবার্য যোগ নেই। শিল্পী তাই সমাজের স্বজনের হয়েও একক—অনেকের মধ্যেও একাকী। তার পথ বন্ধুর। তার সাফল্যের অংশী অনেকেই। কিন্তু সাধনের সঙ্গী কেউ নেই। প্রকৃত শিল্পী তাই বিনীত নম্র, কিন্তু কারও কাছে মাথা নত করে না। আবৃত্তি শিল্পীও এর ব্যতিক্রম নন। মহৎ সত্যকে ভুলে তাকে কেন যেতে হবে সহজতর সমঝোতার পথে? প্রকৃত আবৃত্তি শিল্পীকে আগে সুনিশ্চিত বুঝতে হবে কেন সে আবৃত্তি করতে

চাইছে। অনেকেই আজকাল করে বলে? অন্য কিছু করার ক্ষমতা বা সুযোগ নেই বলে? না কি (সাধারণের যেমন অনেক সময় ধারণা) এর জন্য বিশেষ দক্ষতার দরকার হয় না বলে? এ রকম অনেক কারণ থাকতে পারে। তবু এর প্রকৃত উত্তর এ রকম কোনও প্রশ্নে নিহিত নেই। আবৃত্তিশিল্পীকে এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে আমি যা বলতে চাই, যেমনভাবে বলতে চাই, আবৃত্তিতেই তা সম্ভব— অন্য কোনও শিল্প মাধ্যমে নয়। যেমন কবিতা স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল গান, নাটক ছবির তুলনায়। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। অনেকক্ষেত্রে তা পরিপূরকও। তবু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়তায় তা চিনতে অসুবিধা হয় না।

আবৃত্তিকারের এই মনোভাবের সঙ্গেই এসে পড়বে নির্বাচনের বিষয়। যে কোনও বিষয়ই কি যখন যেমন ইচ্ছে সে বেছে নেবে? নাকি এই বেছে নেবার কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে! থাকতেই হবে। নিছক মনোরঞ্জনই তো সার্থক শিল্পের অভিপ্রায় বা অভীষ্ট নয়। এই সঙ্গেই আসবে কবির কথা। শুধু কি বিশেষ বিখ্যাত কবির কবিতাই নির্বাচন করব? আগের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ইতিবাচক হলে সম্ভবত শুধু কবি নন কবিতাই মূলত বিচার্য। আবৃত্তিকার নিরাসক্ত ভাবে কবির প্রচারক তো নয়। এখানে সে অবলম্বন করেছে কবির ভাষা কিন্তু তাকে মিলিয়েছে নিজস্ব অনুভবে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে। উপলব্ধি আর অনুশীলন ভিন্নতর মাত্রা দিতে পারে চেনা কবিতাকেও যা চমৎকৃত করতে পারে স্বয়ং কবিকে। কবির কবিতার এখানে নতুন জন্ম হল—রূপ রূপান্তর আবৃত্তিকারের শিল্প সাধনায়। এখানেই সার্থক কবিতার সার্থকতা—যা যুগোপযোগী এবং সমসাময়িক। বাইরের চটকদার সাজ পরাবার দরকার নেই এ জন্য, অন্তরের আলো যেন অম্লান থাকে—সন্তর্পণে একটি আলো থেকে আরেকটি আলোয়। এভাবেই কী আবৃত্তি করব এবং কেন—এই ভাবনা মনের মধ্যে মর্যাদা পেলে আমাদের বুঝতে সমস্যা হবে না আবৃত্তি করব কখন এবং কোথায়। অনেকে বলেন আসর বুঝে গান গাও। অর্বাচীনের আসরে ওস্তাদের গান শুনিয়ে বাজিমাৎ করতে যেও না। ওটা হঠকারিতা। এই উপদেশের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সর্বৈব সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। এর বিপরীত অভিজ্ঞতার জন্যই তো এত চেষ্টা করা। মনে পড়ছে এক 'প্রেম' বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বৈষ্ণব কবিতার কাল থেকে প্রায় একাল পর্যন্ত কাব্যে

প্রেম কেমনভাবে ব্যক্ত করেছেন কবিরা কালে, কালে তাই নিবেদন করতে বহু শ্রম ও স্বপ্ন নিয়ে উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠান পরিচালক প্রয়াত সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় সন্তোষ কুমার ঘোষ আমাকে উপস্থাপিত করলেন প্রেমের মানস সরোবর বলে। আন্তরিক সে অনুষ্ঠান উপস্থিত সুধীজন সমাদৃত হয়েছিল কিন্তু আসর জমিয়েছিলেন তাঁরাই যাঁরা হালফিল চটুল প্রেমকে নিয়ে কৌতুক রচনা বা নক্সা পরিবেশন করেছিলেন। উপস্থিত শ্রোতারা তো হোহো হাসিতে উপভোগ করলেনই, পরে পত্র পত্রিকাতেও তাঁদেরই সপ্রশংস উল্লেখ। আমার সনিষ্ঠ স্বল্প সুধীজনের সমাদর পেলেও সাধারণের স্বীকৃতি পেল না। পত্র পত্রিকাও আমাকে বস্তুত অনুল্লেখ্যই রাখলেন। বলতে দ্বিধা নেই একটু ব্যথা পেয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু হতোদ্যম হইনি। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিরল নয়। তবু পথ হেঁটেছি, লক্ষ্য স্থির। এখনও হাঁটছি আজীবন সংকেপে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে দুই পা। রক্ত ঝরছে। ব্যথায় বুক ভারী হচ্ছে। অনিশ্চিত সময়ের মোকাবিলায় আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। এ জীবনে প্রাপ্তিও তো প্রচুর। এবং তাতে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দুইই বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ সবই দুর্নিবার প্রেরণার কাজ করে। তবু সেই আত্মকথনের অবকাশ এখানে নেই। হয়ত বা সমীচীনও নয়।

নিরন্তর প্রার্থনা করি কখনও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'। কখনও বা 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' কখনও নজরুলের ভাষায়'যাহা চাই যেন জয় করে পাই গ্রহণ না করি দান।' জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' ··মনের মধ্যে একই সঙ্গে জাগায় আর্তি, জ্বালায় আগুন—ক্রোধ আর করুণার সমন্বয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তি পাই, পাই স্বজন স্বদেশকে ভালবাসার নিবিড় মমত্ববোধ। জীবন আর জীবিকার দ্বন্দ্বে জীবনের হাত শক্ত করে ধরি। এ সময়ের বন্ধুর পথে আবৃত্তির অপরিহার্য সাহচর্য কবিতাই তো আমার বন্ধু, আমাকে তা বাঁচিয়ে রাখে। বাণিজ্য আর বিনোদনের সমকোতায় সামিল না হবার নিষ্ঠাকে যে বাঁচাতে চাই দুই হাতের মধ্যে জীবন প্রদীপের মত, সে তো আমার কাছে আবৃত্তি অন্যতম শিল্পমাধ্যম বলে নয় আমার আত্মপ্রকাশের অবলম্বন বলে।

তাহলে কোথায় আবৃত্তি করবো অর্থাৎ পরিবেশ, পরিস্থিতি, আয়োজনের উদ্দেশ্য, এ সব নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখতে হবে। নির্বাচন ও উপস্থাপনায় সামঞ্জস্য

থাকবে ঠিকই কিন্তু আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নয়। প্রকৃত শিল্পীর একটা দায়বদ্ধতা থাকা দরকার বলে মনে করি। সময়কে মান্য করে সে সমসাময়িক, আবার সময়কে অতিক্রম করার সাধনাতেই তার প্রকৃত সিদ্ধি। সময়োত্তীর্ণ হতে গেলে সময়টাকেও বুঝতে হবে। যে সময়ে যে সমাজে আমরা বাস করি—সারা বিশ্বে তার সামগ্রিক রূপে রকমফের বিশেষ না থাকলেও রঙের তারতম্য আছে। আছে নানা স্তরবিন্যাস। সাহিত্যে শিল্পে বিশেষত কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটে। আবৃত্তিকারকে তাই উপলব্ধি করতে হবে—বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ আমার সাথে আমারো। এই উপলব্ধি আধ্যাত্মিকই নয় মানবিকও। উচ্চারণ ও আচরণে তাই সততার প্রয়োজন। আবৃত্তিকার শব্দের প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান করে—আভিধানিক নয়, অন্তর্নিহিত অর্থের—মর্মার্থও বলতে পারি। তখন সে দেখবে একটি শব্দের কত অর্থ কত রকম তার বিন্যাস বর্ণ উদ্দেশ্য। এই মণিময় আবিষ্কারের কৃতিত্ব আবৃত্তিকারের। কবি কবিতার জন্ম দেন। আবৃত্তিকার পরিচর্যার পরিষেবায় তাকে নবতর মহিমায় বিকশিত করে—তাই সে শিল্পী এবং স্রষ্টার অনুরূপ দাবিদার। অনেক কবির অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু স্পর্শকাতরতা আছে।

সেজন্য আবৃত্তিকারদেরও কিছু ভূমিকা আছে নিঃসন্দেহে। তাই বলে যাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন আবৃত্তির সাধনা ও প্রসারে তাদের বিচলিত হবার কারণ নেই। সুদিন আসবে বলে বসে না থেকে ধৈর্যসহকারে শ্রমস্বীকার করতে হবে নিয়ত চর্চায়—গভীর মননের সঙ্গে অনুশীলন—নিজেকে বারবার ব্যর্থতার মধ্যেও প্রস্তুত করতে হবে নতুন উদ্যমে। আমার ব্যর্থতা আমাকে এই শিক্ষা দেয়। হতাশা হা হুতাশ নয়—আবৃত্তিশিল্পের বিপুল সম্ভাবনায় প্রত্যয়ী হতে হবে। ভালবাসতে হবে এই শিল্পকে সহজে অর্থ উপার্জনের উপায় বলে নয়--এই শিল্প জীবনের অর্থকে অন্য মাত্রা, মহিমা দিতে পারে—এই বিশ্বাসে ব্রতে নিয়োজিত জীবনে কিছু শ্রম ও সময় দিলে এ জীবন শিল্পও তা সার্থকভাবে ফিরিয়ে দেবেই—হয়ত তা অর্থ নয়, পার্থিব নয় এ প্রাপ্তি পরমার্থ—যেখানে পৌঁছে দেবে সেখানে অফুরাণ আলো অনন্ত প্রাণ অনাবিল আনন্দ আর অপার কল্যাণ।

● প্রবন্ধ

আবৃত্তি ঃ শিল্প ও সংশয়

সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা সমাজের কিছু তথাকথিত কুলীনসম্প্রদায় রায় দিয়েছিলেন গানবাজনা এক অচ্ছুত ব্যাপার। কুলীনকুল চূড়ামণিদের সেই রায় কালক্রমে ক্রমশঃ গৃহিত হয়ে গিয়েছিল বিশেষত শহুরে সাধারণে। সঙ্গীত-সাধনা হয়ে পড়েছিল অপরাধ-যোগ্য। তারই মধ্যে কত যে সঙ্গীত-প্রেমীর গোপন সাধনার ইতিহাস অন্তরালে রয়ে গেল তার কোন লেখাজোখা নেই। সৌভাগ্যক্রমে কিছু জীবন্ত ইতিহাস এখনও আছে। এখনও অনেক বয়স্ক যশস্বী শিল্পী আছেন সেই সব দিন-কাল পেরিয়ে আসার বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে। এখনকার কুলীন-সমাজ সেই একদা উপেক্ষিত শিল্পের অনুষ্ঠান সর্বোচ্চ দক্ষিণা দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসে উপভোগ করে নিজেদের কৌলিন্য রক্ষা করেন। কারণ সঙ্গীত এখন শিল্প হিসাবে একেবারেই ব্রাত্য নয়। কিন্তু আবৃত্তি সে কি শিল্প? কেউ কেউ নিঃশংসয়ে মেনে নিতে পারেন না। বিষয়টা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

এবিষয়ে আমার ধ্যান-ধারণাকে বিবৃত করার আগে বলে রাখি ঃ পুনরুল্লেখ করবনা অনেক কিছুই—যে সবের জন্য প্রচুর আকর-গ্রন্থ আছে এবং যা দুষ্প্রাপ্যও নয়। যেমন ঃ উচ্চারণ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ওষ্ঠমূল থেকে নাভিমূল পর্যন্ত চেনার তাৎপর্য ওতার সাধনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। উচ্চারণ করব না কণ্ঠ-সাধনার বিবিধ প্রক্রিয়ার কথা। উল্লেখ করব না ছন্দ-সুষমা ও তার বৈচিত্র নির্মাণের উপায় ও উপযোগিতার কথা। পুনরুল্লেখ করব না আবৃত্তি-শিল্পের প্রাচীন ৬৪ কলার অন্যতম দুই কলা থেকে শুরু করে আধুনিকতম কবি বা বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক স্বীকৃতির কথা। এরপরে যা কিছু উল্লেখিত হবে তা একান্ত ভাবেই আমার ব্যক্তিগত নিবিষ্ট ভাবনার কিছু সারাৎসার ঃ—যে টুকুর জন্য আলোচনা, সমালোচনা এমন কি কৈফিয়তের জন্যেও আমি কান পেতে থাকব। কারণ এই

পর্যায়ের আলোচনার জন্য দায় বা দায়িত্ব কবির নয়, কবিতার নয়, আবৃত্তির নয়, শিল্পের নয়—আবার এই সব মিলিয়ে একাণ্ডই আমার।

"সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি"—এই উচ্চারণের সত্যতায় যদি দ্বিধা না থাকে, তাহলে এই উপসংহারে আসা বোধহয় অসংগত হবে না যে, সকল কবিতাই কবিতা নয় কিছু কিছু কবিতা। আর শুধু কবিতাই বা কেন, সকল সৃষ্টির রসোত্তীর্ণতার ক্ষেত্রেই বোধহয় ঐ "কেউ কেউ," বা "কিছু কিছু" অব্যর্থ ভাবে প্রযোজ্য ; এবং অনিবার্য ভাবেই আবৃত্তির ক্ষেত্রেও।

কথাটা হল রসসৃষ্টি। রস কাকে বলে ? এই নিয়ে প্রসিদ্ধ আলংকারিকরা অনেক কথা বলে গেছেন। তাঁদের দীর্ঘ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পুনরুল্লেখ না করেও এর সারাংশ, যা কিনা আমার কাছে উপলব্ধ হয়, তা হল ; যে শিল্পকর্ম আমাদের অনুভূতির সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে অনুরণন তোলে, প্রকম্পিত করে, রসাবেশ সৃষ্টি করে এবং তার মোক্ষণ ঘটায়—তা-ই রস। তাই যে কোন মাধ্যমেই শিল্পের প্রকাশ ঘটুক না কেন, রসমোক্ষণই শিল্পের শেষ কথা। যার একদিকে স্রষ্টা অন্যদিকে ভোক্তা—মাঝখানে রসের সেতু বেয়ে তাদের মহামিলন। আর কাব্যের ক্ষেত্রে তাইতো "রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্।"

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে না হয় রসসৃষ্টিতে সক্ষম হলেন সেই "কেউ কেউ" কবিরা ;— তা বলে সেই কাব্য পাঠ বা আবৃত্তি, কেমন করে শিল্পের আঙ্গিনায় তার স্বতন্ত্র সত্তার নিশান ওড়াতে পারে !—এমন বেহায়া প্রশ্নের সততই আনাগোনা।

আমার বিস্ময় লাগে যখন পৃথিবীর এই অন্যতম প্রাচীন শিল্পটিকে নিয়ে এখনও কিছু তথাকথিত শিল্প বোদ্ধাকেও দ্বিধান্বিত হতে দেখি ! এই যে বললাম 'বিস্ময় লাগে', সত্যিই তেমন বিস্ময় লাগে কি ? না কি বলার অভ্যাসে বললাম ? কত কিছু দেখে বা বুঝেই তো 'বিস্ময়' লাগে, আবারও বলছি তেমন ক'রে লাগে কি ? আসলে আমি বলতে চাইছি এই 'বিস্ময়' শব্দটা কেমন জিব-সওয়া, গা-সওয়া, মন-সওয়া হয়ে গেছে—তার ওজন, ভার, শক্তি তেমনটি আর আছে কি ? স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে—তেমনটি মানে কেমনটি ! স্বাভাবিক। তবু বলি ঃ একদিন মানুষ বনের মধ্যে দাবানল দেখে বিস্মিত হয়েছিল, একদিন ভূকম্পনে, একদিন সূর্যগ্রহণে চন্দ্রগ্রহণে, একদিন অগ্ন্যুৎপাতে, একদিন নর ও নারী পরস্পরের সম্পূর্ণ নগ্ন অবয়ব দেখে (জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে), একদিন একটা মানুষ আর একটা মানুষকে মেরে ফেলল এই কাণ্ড দেখে—এই সব !

এইসব কদাচিৎ কখনও ঘটে যাওয়া এক একটা প্রলয়ংকর ব্যাপার মানুষকে বিস্মিত করেছিল। তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে, শিরায়-উপশিরায় সঞ্চারিত এক বোধকে আলোড়িত করেছিল যে অনুভূতি— বোধহয় তার নাম 'বিস্ময়।'

এখন হয়তো প্রত্যহ দু'হাজার বার ঘটছে এমন বিস্মিত হবার ঘটনা, পাঁচ হাজার বার উচ্চারণ করছি 'বিস্ময়'-এই শব্দ। কিন্তু যদি কল্প-কাহিনীর মত ধরে নিই পৃথিবীর সকল দেশের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারিত শব্দের নাম 'বিস্ময়'— তাহলে বর্ত্তমানে প্রত্যহ পাঁচ-হাজার বার সেই শব্দের উচ্চারণের মধ্যে থাকতে পারে কি সেই শক্তি, সেই অনুভূতি, সেই বোধ, সেই ঘোর—যার নাম 'বিস্ময়!'— যা কিনা একদিন মানুষের মুখ থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছিল। সূর্যগ্রহণ, কিম্বা দাবানল, কিম্বা অগ্ন্যুৎপাত কিম্বা মানুষের হাতে মানুষের প্রথম হত্যা ইত্যাদি দেখে!

ঠিক একই ভাবে 'প্রেম' 'ভালবাসা'র মত শব্দগুলো ইদানিং প্রেমহীন অস্তিত্ব নিয়ে মাছির মত ভন্‌ভনিয়ে ঘুরে বেড়ায় যত্রতত্র। 'প্রীতি' শব্দটা ইদানিং চিঠিপত্র, আর কখনও কখনও কোন ঘোষকের কণ্ঠে বর্ণহীন নিয়ম-মাফিক বাজে। 'মমতা' শব্দের অস্তিত্ব অনুসন্ধান-যোগ্য হয়ে উঠেছে। 'নিপীড়ন,' 'নির্যাতন,' 'হত্যা'র মত ভয়ংকর শব্দগুলো কেমন আজকাল জলভাত। এমন দৃষ্টান্তের কোন শেষ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল: উল্লিখিত শব্দাবলীর কি এমনই স্বরূপ, যেমন ভাবে আজ তা সচরাচর ব্যবহৃত? নাকি এই শব্দরাজির গায়ে জন্মমুহূর্ত্তের পবিত্র দাগ লেগে আছে আজও! জন্মমুহূর্ত্তের পবিত্রতা আশ্চর্য্য এক চিরপ্রবহমান অভিজ্ঞতা। ভূমিষ্ঠ হবার পরেই শিশু কাঁদে, কি বুঝে,কি জেনে কাঁদে সে? বেশতো ছিলাম অন্তর্লীন বিশ্রামে, কেন আবার টেনে আনো এই কাজ-অকাজের টানা-পোড়েনে – এই জন্যে? নাকি প্রথম ঝলমলে আলো দেখার মুক্ত-ইচ্ছার উচ্ছ্বসিত প্রকাশে? আসলে আমার মনে হয়: সেই সদ্যজাত সত্তা অন্য কোন ভাবে নয় শুধু শব্দের নির্ঘোষে জানান দেয় তার অস্তিত্ব। এ শব্দ বাণীরূপ নয়, স্বররূপ (অনন্তকাল বিকৃতিহীন একই রূপে)। আর এই স্বররূপের গর্ভেই জন্ম নেয় বাণীরূপ, ধীরে ধীরে। সেই শিশুর কণ্ঠে ক্রমস্ফুটিত বিস্ময়-আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ভীতি— একই রকম অবিকৃত অনন্তকাল। তাই শব্দের জন্মদাগ মোছে না। তার পবিত্র হেমরূপ, অনির্বান।

আসলে সেই পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে মানুষের প্রতিমুহূর্ত্তের বহুবিধ অসংলগ্ন আচরণে। আর সেই নষ্ট-আচরণের ছোপ লেগে যাচ্ছে শব্দাবলীর গায়ে।

দিন-গুজরানে ব্যাস্ত মানুষ ক্রমাগত অভ্যাস্ত হয়ে, সেই ছোপ-লাগা শব্দগুলোকেই চিনছে হয়ত।

ঠিক এই অবস্থাতেই শুরু আবৃত্তিকারের শিল্পানুসন্ধান। যা পূর্ণতা পায় ক্রমে ক্রমে যথাযথ প্রয়োগশৈলিতে। আবৃত্তিকার শব্দের যা কিছু অমলিনত্ব তা বজায় রাখেন। এবং যা-কিছু ছোপধরা মলিন, তাকে মাজা ঘষা ক'রে তার হেমরূপ উদ্ঘাটিত করে দুলিয়ে দেন শ্রোতার কানে। শব্দ ও তার অর্থবহ বিন্যাস, আবৃত্তিকারের কাছে কখনই শুধুমাত্র রেখারূপের বন্ধনে আবদ্ধ নয়; প্রত্যেকটা শব্দই এক একটা নিটোল অনুভূতি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার সত্তায়—সেই অনুভূতিকে ব্যঞ্জিত করতে পারে সে স্বর-ক্ষেপনের এবং প্রার্থিত সুর-লেপনের অধীত বিদ্যায়। এখানে সুরলেপন বলতে লীলায়িত গীতিরূপের কথা বলতে চাইনি। 'বজ্রধ্বনি' আর 'টাপুর-টুপুর বৃষ্টি'র সুর কি এক? 'জলোচ্ছ্বাস' আর 'নির্ঝরিনী'র উচ্চারণ একই সুরে ব্যঞ্জিত হতে পারে? আর কাব্যের ক্ষেত্রে 'ছন্দের' জাদুকরী শক্তিকে মুক্তি দেবে কে—আবৃত্তিকার ছাড়া!

এই রচনাকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভারাক্রান্ত করার কোন ইচ্ছে আদৌ আমার নেই। তবুও এই মুহূর্তের প্রসঙ্গে একটা উদ্ধৃতি অনিবার্য ভাবে কড়া নেড়ে চলেছে অবিরাম। মাইকেল মধুসূদন দত্তের যুগান্তকারী কাব্যোৎকর্ষের রসাস্বাদনে তখনও পর্যুদস্ত—প্রায় সমস্ত সমকালীন কাব্যপ্রেমী ও বুদ্ধিজীবিরা। এমন অবস্থায় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের একটি পত্রের ভগ্নাংশে এই উদ্ধৃতি "My advice is read read and read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is."

আসলে একটা ভাষার শব্দের ধ্বনিমাধুর্য ও অর্থের গভীরতার সুসামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। একাজ কে করবে আবৃত্তিকার ছাড়া! আবৃত্তিকারকে প্রত্যেক শব্দকে ধ্যান করতে হয়, তার কাছে নতজানু হতে হয়। এই আনত শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথক ভাবে খুলে দেয় তার হৃদয় দুয়ার—নির্গলিত হয় তার রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ। তার স্পর্শে আবৃত্তিকার ধন্য হয় তখন। শব্দও তখন মুক্তির আনন্দ পায়। আসলে আবৃত্তিকারের উচিৎ, একই সঙ্গে ভূমি ছুঁয়ে, আকাশ চিনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।

হ্যাঁ উচিত। সেই ঔচিত্যের কথায় আসি। ধরে নিতে পারেন এ এক উন্মাদের কার্যক্রম।

আবৃত্তিকারের উচিৎ: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা। সারারাত ঘুমোনো ও

সারাদিন জেগে থাকা। সারাদিন ঘুমোনো, সারারাত জেগে থাকা। রাত-দুপুর অবধি ঘুমোনো।

ভোরের শিশির-বিন্দু—পায়ের পাতায় স্পর্শ পাওয়া। তর্জনীতে তুলে নিয়ে সেই শিশির-বিন্দু জিবের ডগায় স্বাদ নেওয়া! দু-চোখ ভ'রে ধানক্ষেতের সবুজ বন্যা দেখা। ধান-চারাটির কাছে গিয়ে, সদ্য-ফোটা ধানের শিশের বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুধের স্বাদ নেওয়া—টিপে, ছুঁয়ে, ছেনে, জিভে। স্বর্ণাভ ধানের পাশে দাঁড়িয়ে তার ফলন্ত-তৃপ্তির উচ্ছ্বাস দেখা!

তারপর ?

ধানকাটা, ধানঝাড়া, ধানমাড়াই, ধানকোটা।

তারপর ?

তারপর ধু-ধু মাঠের খোড়ো শূন্যতা। সেখানেও শিশির-বিন্দু কোথায় যেন লুকোয়। সেখানে শালিখেরা আসে, কি যেন খোঁজে! সেখানে প্যাঁচারা আসে, এবং ঊর্দ্ধাকাশে দেখা যায় শকুনের ডানা কিসের সন্ধানে!

ফুটিফাটা কাতর মাঠ। আবার জল থৈ থৈ ডুবন্ত মাঠ।

এ যেন দুই আকাল। দুই আকালের মাঝখানে অনেক দিন :—ফলন্তদিন, ভরন্তদিন, পড়ন্তদিন, নিভন্তদিন—এই সবকে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে চলার মত ক'রে দেখা, বোঝা, সেই রাতজাগা-রাতঘুম, দিনজাগা-দিনঘুম থেকে শুরু করে—ফলন্তদিন, নিভন্তদিন অবধি একটা জিনিষ অবিরাম করে পড়ছে লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে—তার নাম শব্দ। আসলে কোলাহলের মধ্যেও নৈঃশব্দ থাকে। আবার স্তব্ধতার মধ্যেও শব্দের আনাগোনা। সেই শব্দের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-আজল নিঙড়ে নিয়ে অনুশীলিত অভিজ্ঞান, উপলব্ধি ও মননের সংযোগে তাকে ধারণ করতে হয় কণ্ঠে। তাই আবৃত্তিকারের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রেখাময় শব্দাবলী প্রাণময় হ'য়ে ঢুকে পড়ে শ্রোতার অন্তরে।

এমনি করেই বেরিয়ে পড়তে হবে পুকুরে, খালবিলে, নদী-নালায়, সমুদ্রে, খোয়াইয়ে, পাহাড়ে, পর্বতচূড়ায়। তারপর ঝর্ণায়, প্রস্রবণে, বনে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে—মরুতে, মহাকাশে, শব্দরা ধীরে ধীরে আসবে, কথা বলবে, বন্ধুত্ব হবে; আর তখনই না সেই বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটবে আমার কথকতায়—যদি আমি বলি আমি শিল্পী আমি আবৃত্তিকার!

'কবিতা কি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্প! যাঁরা এ সংশয় প্রকাশ করেন তাঁদের

যুক্তি : আবৃত্তিকারের সৃজনশীলতা কোথায় ! কবিতা-আবৃত্তির ক্ষেত্রে কবি হলেন সৃজনশীল। আর আবৃত্তিকার সেই লিপিবদ্ধ কবিতাকে স্বরবদ্ধ ক'রে ক্ষেপণ করেন মাত্র—এতে সৃজনশীলতা কোথায় ! এই অভিযোগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সুনিশ্চিত উত্তরও।

নবনির্মাণই যদি সৃজনশীলতা হয়, কবিতো তাঁর ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন মাত্র—'স্বরবদ্ধ' তো করেননি ! তাহলে সেই কবিতার 'স্বরবদ্ধ'তা কি কোন নির্মাণ নয় ? দ্বিতীয়তঃ আবৃত্তিকার কবিতাকে শুধু স্বরবদ্ধই করলেন না তাকে 'ক্ষেপণ'ও করলেন। একাজও তো কবি করেননি, করলেন আবৃত্তিকার—এও তো আর এক নির্মাণ !

এরপরেই সমালোচকের লক্ষ্যভেদী প্রশ্ন : তাহলেতো অক্ষরজ্ঞান সম্বলিত যে কোন মানুষই ঐ দুটো কাজ অনায়াসে করতে পারেন—অতএব তাঁরা প্রত্যেকেই আবৃত্তি শিল্পী !

এর উত্তরে শ্রীমধুসূদনের উল্লিখিত উক্তিটি, ও তার প্রাসঙ্গিকতা আর একবার স্মরণ করতে বলি, এবং তারপর আমার সবিনয় উত্তর : যে কোন কবিতাকে স্বরবদ্ধ করতে গেলে যে অভিজ্ঞান লাগে তা কি অক্ষরজ্ঞান-মাত্র সবারই করায়ত্ত ?

দ্বিতীয়তঃ আবৃত্তিকারের মূল শিল্পাস্ত্র স্বরক্ষেপণ। এই ক্ষেপণ হতে হবে অব্যর্থ। বুঝতে হবে কোন স্বরের কি ওজন কি স্ব-ভাব। এবং কি ভাবে তা ক্ষেপণ করলে শ্রোতার সঠিক তন্ত্রীটি সে স্পর্শ করে ঝংকার তুলবে। উচ্চারণ আর ক্ষেপণ কি এক ? ক্ষেপণ আর লক্ষ্যভেদ—একই নাকি ?

ধনুর্বাণ থাকলে হয়তো আমিও শরক্ষেপণ করতে পারি আর তাতেই কি বিদ্ধ হয়ে যাবে 'মীনাক্ষী' !—এবং আমিও হয়ে যাবো অর্জুন !!

আচ্ছা, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, বিশেষত কাব্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ অভিযোগতো কখনও তোলা হয়নি যে তা স্বয়ং-সম্পূর্ণ কিনা ! সেখানেতো ব্যাপারটা আরও ছড়ানো। এমনতো হামেশাই হচ্ছে—লিখছেন একজন, সুর দিচ্ছেন অন্য আরেকজন, গাইছেন অন্যতর জন ! এই ভাবে যে, কাব্যগীতির বহুল-প্রচলন,—তার মধ্যে কোনজন স্বয়ং-সম্পূর্ণ !—তাওতো আনুসঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রের কথা উহ্য রেখেছি। কাব্যগীতি তাহ'লে শিল্প হয়ে উঠল কি করে ? আর আবৃত্তি নয় !—এ কার নিদান ?

কথা আরও থেকে যায় তবু। হ্যাঁ থেকে যায়। প্রাসঙ্গিক আলোচনার

নিরীখে 'নাটক' কি করে শিল্প হ'য়ে ওঠে ? সিনেমা ? অর্কেস্ট্রা !

আমার মনে কোন সংশয় নেই-যা কিছু উল্লেখ করলাম সে-সবের শিল্পসত্তা সম্পর্কে। বিস্ময়-চিহ্নগুলো শুধু জুড়েছি যাঁদের ভ্রূভঙ্গীতে বিস্ময়-চিহ্ন প্রতিভাত হয় শুধুমাত্র 'আবৃত্তি'কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ-শিল্প বলতে তাদের জন্য।

সংশয়-বিলাসীদের জন্য আরও কিছু রসদ আমার ছোট্ট ঝুলিতে আছে। তার কয়েকটির কথা উল্লেখ করলাম :— (১) একদিন এক অনামী কবির একটি ভাল-লেগে যাওয়া কবিতা সৌভাগ্যবশতঃ কবির সামনেই আমি আবৃত্তি করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কবিতাটি লিখে আমি এত তৃপ্ত হইনি আজ যেমনটি হলাম !

(২) রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর শা-জাহান কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক উঠেছিল অনেক। সঠিক ব্যাখ্যা চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্রাঘাত করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই রকম ছিল (উদ্ধৃতি চিহ্ন না দিয়ে স্মৃতি থেকে বলছি)—যখন লিখেছিলাম, এক স্বতোৎসারিত বোধ থেকে লিখেছিলাম। এখন তাকে বাইরে থেকে তোমরা যেমন দেখছ, আমিও একজন তোমাদেরই মত। তবুও আমার ধারণা আমি জানাচ্ছি—পছন্দ না হলে তোমরা তোমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ কোরো, অসুবিধে নেই।

এমন অনেক ঘটনাই কি ঘটেনি রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেক কবিতা নিয়ে, গান নিয়ে, 'গোরা' নিয়ে 'রক্তকরবী' নিয়ে !

এসবের নবব্যাখ্যা প্রতিফলিত হয়েছে,—আবৃত্তিতে, গায়কের কণ্ঠে, নাট্য প্রযোজনায়। কে ভুল ? কে ঠিক ? কোনটা শিল্প !

(৩) আমি জন্মাবধি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আসছি—যেমন শোনেন অগণিত অনেকেই। আমার অভিজ্ঞতার কথা এই—অনেক শোনার অভ্যাসে অনেক সুরই পল্লবিত হত মনের মধ্যে। মাঝে-মধ্যে দু-চার কলি বাণী। কবে মনে নেই, দেবব্রত বিশ্বাস বেজে উঠলেন। অনেক দিনের শোনা সুর, শোনা কথা। তবু দেবব্রতর হাত ধরে রবীন্দ্রনাথ ঢুকে পড়লেন আমার অন্তরে। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা বিনিময় দেবব্রত বিশ্বাসের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী কিনা এপ্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাস ? শিল্পীতো ? রবীন্দ্রসঙ্গীত নিশ্চয়ই তাঁর রচনা নয়। সে রচনায় সুর-দানও তাঁর নয়। তিনিতো শুধু স্বর ও কণ্ঠদান করেছিলেন। তাহলে ? তিনি শিল্পীতো ?

এই প্রশ্নের উত্তরের লোভ সংবরণ করতে পারছিনা কিছুতেই। তিনি উপলব্ধি দান করেছিলেন। তিনি শিল্পীতো? কবিতা ও আবৃত্তি আমার আত্ম-প্রতিম। তাই এতক্ষণ আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি আমার ধারণামত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী মনন ও মমতা দিয়ে। আপাতত এপ্রসঙ্গ শেষ করব কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

আবৃত্তি কোন স্বতন্ত্র শিল্প কিনা, এই নিয়ে যে সংশয়, দ্বিধা মানুষের মনে—এর কি কোন দায় নেই আমাদের? আবৃত্তিকারদের? আমি বলব আছে। এবং সে দায় সম্পূর্ণত আমাদেরই।

আমরা, যারা জল-মাটি-আকাশ-বাতাস শুধু দেখেছি মাত্র, বুঝিনি, চিনিনি; এই ভূমণ্ডলের আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির সঙ্গে এই বিশ্ব-প্রকৃতির থেকে স্বতোৎসারিত শব্দরাজির ক্রমপরিবর্ত্তনশীলতাকে অনুভবের চেষ্টা করিনি—সেই আমরা প্রকাশ করব কি করে হাওয়া কখন শন্‌শনায়, কখন সে ফুরফুরে, কখন সে ঝটকা, কখন মৃদুমন্দ, কখন-ই বা সে দাপায় বা আরো, আরো অনেক কিছু।

আমরা, যারা বৃক্ষ চিনিনা, পাখি চিনিনা, শ্বাপদ চিনিনা, তাদের স্বভাব-বৈচিত্র্য বুঝিনা—কি করে প্রকাশ করব যখন তাদের অনুসঙ্গ কোনো কবিতায় আসে!

আর মানুষ! সেতো দূরে-অস্ত। চব্বিশ ঘন্টায় সে শতরূপে বিরাজে। আর এক জীবনে, কতরূপে! এতো একটা মানুষের কথা। আর মানুষ যখন অগণিত, তখন!!

মনে হতে পারে কে হে তুমি আবৃত্তিকার বড় বড় কথা বল? সবিনয়ে বলি, বড়-বড় কথা নয়। এসবই ধ্রুব। আমি কেউ নই। যথার্থ আবৃত্তি শিল্পী যদি না হয়ে উঠতে পেরে থাকি, কারণ সম্ভবত, ঐ উচিৎ কাজগুলো যথাযথ ভাবে আমার ক'রে ওঠা হয়নি।

যা কিছু কঠিন, তা কম-মানুষের আয়ত্বাধীন। তা কম জনপ্রিয়। কিন্তু সে-সকলই আবার থেকে যায় চির-আকর্ষণীয়, যেমন এভারেস্ট কিম্বা এ্যান্টার্কটিকা। অনেকে পৌঁছতে পারবনা মানে এটা তো নয়, সেগুলো নেই!

শিল্পের দুর্লভ আঙ্গিনায় 'আবৃত্তি' তার স্বতন্ত্র নিশান উড়িয়ে দিয়েছে স্মরণাতীত কাল আগে। যদি তাকে কেউ স্পর্শ করতে না পারে, তার দায়তো শিল্পের নয়। যাঁরা তাকে ছুঁতে পারলনা তাদের। আর শুধুমাত্র আবৃত্তিই বা কেন, যে-কোন শিল্প-মাধ্যমেরই সার্থকতার নিরীখ-বিচারে এই সারসত্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। □

প্রসঙ্গ আবৃত্তি

আবৃত্তি আর অভিনয় দুটো স্বতন্ত্র শিল্প—কিন্তু দেখেছি, অনেকেই দুটোকে অভিন্ন মনে করেন। তাই গলা কাঁপিয়ে এবং হাত পা নেড়ে আস্ফালন করাকে তাঁরা চালিয়ে দেন আবৃত্তি বলে। আবৃত্তি বাচন শিল্প—অভিনয় আনুষ্ঠানিক শিল্প, আকারে সমধর্মিতা থাকলেও তাই প্রকাণ্ড প্রকারভেদ রয়েছে দুটোর মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক এক সময়ে এক একটা যুগে শব্দের ছক যে রকম থাকে তার পরের যুগে সে রকম থাকেনা, বদলে যায়। সেইজন্য একটা যুগে রবীন্দ্রনাথ যে রকম করে যে কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছেন এখন আমরা সেভাবে করতে পারিনা।

শম্ভু মিত্র

কবিতা যেমন বাচনমাত্র নয়, বাচন আর গূঢ়তর সুরের বুনুনিতেই যেমন কবিতা—তেমনি পড়ার মধ্যেও চাই প্রচ্ছন্ন এক সুর ও নাটক। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন কোথাও এই সুর বা নাটক আলগা হয়ে মাথা না তোলে. শ্রোতাদের যেন এমনি মনে হতে থাকে যে গোটা ব্যাপারটাই প্রতিদিনের কথা-বার্তার সন্নিহিত। যেমন কবিতায়, তেমনি কবিতা পড়ায়, এ দুটিকে মিলিয়ে নেওয়া খুবই শক্ত কথা—কিন্তু এই মিলিয়ে নেওয়াই হলো সত্যিকারের পথ।

শঙ্খ ঘোষ

আমি আবৃত্তিকারের অহংকারের থেকে কবির অভিপ্রেত জীবনাবেগকে বেশি মূল্য দিতে চাই, কবিতাকে ভালোবেসে আবৃত্তিকার কবির রথের সারথ্যের দায়িত্ব নিয়ে কবিতাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবে, আবৃত্তির কাছে এইটেই আমার প্রাথমিক প্রত্যাশা।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু তার ভূমিকা নিশ্চয় কবিতা উপলব্ধির ভূমিকার চেয়ে বড়ো হতে পারেনা। যদি সে উপলব্ধির প্রকাশ না থাকে তাহলে কণ্ঠবাদনই বড়ো হয়ে ওঠে, যার ফলে আবৃত্তিকারের শৈল্পিক দক্ষতায় শ্রোতারা অভিভূত হন এবং তাঁরা কবিতাকে গৌণ করে বাহবা দেন আবৃত্তির কৌশলকে।

অরুণ মিত্র

পাঠ আর আবৃত্তির মধ্যে—আরো খোলসা করে বলতে গেলে—বইখাতা দেখে কবিতা বলা আর স্মৃতি হাঁতড়ে কবিতা বলার মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন রকম পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করিনা। সম্যক বোধযুক্ত পাঠই আবৃত্তি।

দেবব্রতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কবিতা আবৃত্তি করার উৎকণ্ঠিত আকাঙ্খা থেকেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার, প্রবর্তন, প্রয়োগ ও প্রচলন ঘটাতে পেরেছিলেন। কারণ অমিত্রাক্ষর নীরব পাঠের ছন্দ নয়, বাংলার প্রথম আবৃত্তির ছন্দ। **অরুণ কুমার বসু**

শাস্ত্রকারগণ বলেছেন 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী'—অর্থাৎ সর্বশাস্ত্র পাঠে যে বোধ বা জ্ঞান অর্জিত হয়, আবৃত্তিতে তার চাইতেও অনেক বেশি জ্ঞান লাভ হয়। আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মন্ডিত হয়েই আবৃত্তি এই মর্যাদা লাভ করেছে। **সুজন চন্দ**

আবৃত্তি বস্তুটি মূলত subjective এবং অভিনয় বস্তুটি objective. একটি আমাদের চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অপরটি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত। এই কারণে আবৃত্তিকারকে সার্থকতা লাভ করতে হলে অবশ্যই intellectual হতে হবে, তার স্থান কবিরই পাশে এবং তিনিও একজন স্রষ্টা। **রাজ্যেশ্বর মিত্র**

গদ্যপাঠও কি আবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে? আমার তো মনে হয়, নিশ্চয়ই। কেননা, সেখানেও প্রবহমানতা, যতি ছন্দ, মাত্রা, ভাবের ক্রমপরিণতি—সবই রয়েছে। **অজিত বসু**

যখন কবিতা তখন সেটা সাহিত্য, যখন সেই কবিতা আবৃত্তি করা হয় তখন তা অন্য শিল্প। শিল্প হয়ে সে আর একবার সম্পূর্ণ হয় অন্যভাবে। তখন প্রতিপাদ্যের পাশে এসে দাঁড়ায় নির্দেশ। সেই নির্দেশকেই আবৃত্তির নির্মাণ বলে আমরা অভিহিত করতে পারি। **অমিয় চট্টোপাধ্যায়**

আবৃত্তি আজকে যে অর্থে সাধারণ মানুষের মনে আর হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে, আবৃত্তি আসলে তা নয়। আবৃত্তি পুনরুচ্চারণ নয়, আবৃত্তি হচ্ছে উচ্চারিত ধ্যান ধারণা আর ভাবনার সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য পরিণীতা, ভয়ে কাঠ রমণীকে যেমন একান্ত মমতা নিয়ে কোমল স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগাতে হয়, তেমনি করে শ্রোতাদের সামনে ছাপা কবিতাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে রক্তমাংসের আদল দিতে হবে। আবৃত্তিকার সেই পুরোহিত, যিনি কবি আর শ্রোতার অন্তরের শুভ পরিণয় ঘনিয়ে তুলবেন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মানবিক মূল্যবোধ জাগানোর উপাদান হিসেবে আবৃত্তি একটা বড় শিল্প।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবৃত্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্র কবিতা

শিখা বিশ্বাস

আবৃত্তি আজ সাহিত্য ও শিল্প জগতে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। আর আবৃত্তি কথাটির সাথে সাথে মনে আসে রবীন্দ্র কবিতার কথা। আবৃত্তি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করেও মনের মণি কোঠার দ্বারে যে পৌঁছে যায়, সেটা মূলতঃ দুটি কারণে—এক, আবৃত্তির সৌষ্ঠব, এবং দুই, যে কথাগুলিকে আমরা স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে তুলে ধরি, সেই কথাগুলির অর্থ এবং প্রাসঙ্গিকতা। যে মূল সুরটি কবির মনোজগতে অনুরণিত হতে হতে কাব্যের রূপ নেয়, তার কাছাকাছি পৌঁছবার প্রচেষ্টা আবৃত্তিকারের মধ্যে যত প্রবলই হোক না কেন, আবৃত্তিকার আমাদেরকে উত্তরণের আনন্দ দিতে পারবেন না, যদি না সে কবিতার আবেদন হয় সার্বজনীন। তাই আবৃত্তি নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেও দেখা গেছে, কালের প্রভাবকে উপেক্ষা করেও, রবীন্দ্র কবিতা আজও আবৃত্তির ক্ষেত্রে আমাদের কাছে সমান আবেদন নিয়ে হাজির হতে পারে। এর একটি বড় কারণ মনে হয়, রবীন্দ্র কবিতার ভাব এবং শব্দচয়নের মধ্যে অসাধারণ সাযুজ্য। ধরা যাক 'ফাল্গুন' কবিতার কথা। কবিতাটিতে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ এমনি উপযোগী এবং সুন্দর যে, তা বসন্ত ঋতুরই দ্যোতক। সে কবিতার ভাব যখন স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে যুগপৎ ধ্বনিময় এবং চিত্রময় হয়ে ওঠে তার কি তুলনা মেলে? তেমনি 'ঝুলন' কবিতার ঝংকৃত আবেগ কবিতাকে এনে দেয় এক আলাদা মাত্রা। আবার মৃদু মন্দ বাতাসে ভোরের পাখির ডাক যখন কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তখন আমরা দেখি, কবির শব্দ চয়নে যুক্তাক্ষর প্রায় অনুপস্থিত, যেটা শান্ত সমাহিত পরিবেশেরই ইঙ্গিত বহন করে। এভাবে অসংখ্য কবিতার উদাহরণ দেওয়া যায়। এর পরেও যে কথাটি থেকে যায়, তা হলো আমাদের মনের সব রাগ বা ভাব, যাকে আমরা mood বলি, তার সবটাই কবির অসাধারণ লেখনিতে ধরা পড়েছে। আমরা ভুলেই যাই, প্রাত্যহিক জীবনেও আমাদের প্রতিটি কথা, যা নান্দনিক বোধের দ্বারা সম্পৃক্ত, তার সবটাই রবীন্দ্রনাথের কথার ছায়ায় প্রভাবিত। এ হেন যে কবি, তাঁকে আবৃত্তিকারেরা যে শিরোমণি ভাববেন, তাতে আর সন্দেহ কি? অসাধারণ কাব্যিক সৌন্দর্য্য, শব্দচয়নের পারদর্শিতা, মানবিক আবেদন এবং বিশ্বনিয়ন্তার কাছে আত্মনিবেদনের আর্তি—এই ক'টি কারণে আবৃত্তির ক্ষেত্রে অন্য কবিদের কবিতা আজও রবীন্দ্র কবিতাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। □

● একটি আবৃত্তি আলেখ্য

বলাকা

সাগর বিশ্বাস

রবীন্দ্র কাব্য বিশেষজ্ঞরা অনেকে কবি জীবনকে মূলতঃ চারটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্ব—কবির প্রতিভা উন্মেষের যুগ—অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত উল্লাস আর ভাবাবেগ প্রকাশের যুগ। তাঁর নিজের কথায় 'আমার প্রথম কবিতাগুলিতে আমি নিজেই জানিনা কি বলতে চেয়েছি'। দ্বিতীয় পর্ব—সৌন্দর্য-চেতনার যুগ। এই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রূপ-রস মাধুর্য সম্ভাত যে অখণ্ড সৌন্দর্য দৃশ্যমান, তার অতলান্তিক গভীরতা ও মহাকাব্যিক সুষমা কবিমনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে তোলে যে এই পর্বে কবির সততই মনে হতে থাকে যে লীলায়িত সৌন্দর্যের একটি abstract নারীমূর্তি যেন তাঁর সকল কাব্যপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ক্রমশ সেই মানসসুন্দরী ও অপার সৌন্দর্যময়ী নারী কবির জীবনদেবতা এবং পরিশেষে বিশ্বদেবতায় রূপান্তরিত হয়। 'মানসী' থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত এই পর্বের ব্যাপ্তি। তারপর 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' পর্যন্ত আর এক পর্ব। এখানে প্রকৃতির রূপে রসে বিশ্বদেবতাকে অনুভব নয়—কবির ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে তাঁর নিত্যলীলাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় রসশিল্পের যুগ। পরবর্তী পর্ব শুরু 'বলাকা' কাব্য থেকে যাকে অনেকেই 'বলাকার যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'বলাকা' থেকে 'পরিশেষ' পর্যন্ত চলেছে এই ধারা। এই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সৃষ্টিকর্তার যে নিত্যলীলা, কবির ব্যক্তি সত্তাও যে লীলার অন্তর্ভুক্ত, সেই সর্বব্যাপী সত্যের মধ্যে জীবনের এক চিরন্তন নিরবচ্ছিন্ন গতিবাদের উপলব্ধি। এই নবলব্ধ গতিবাদের কথা এমন অসাধারণ কাব্য সুষমায় প্রকাশিত হলো যে এই পর্বের কাব্য সম্ভার চিন্তাশীল রসজ্ঞ পাঠকের পরিণত ও পরিশীলিত হৃদয়ের উপভোগের সামগ্রী হিসাবে চিরকালের মত চিহ্নিত হয়ে রইলো।

আমাদের বর্তমান নিবেদন এই 'বলাকা'র কথা নিয়ে। বলাকা যৌবনের দূত—বলাকা গতির প্রতীক। বলাকার উড়ন্ত পাখায় কবি উপলব্ধি করেন উপনিষদের শাশ্বত বাণী, সৃষ্টির চিরন্তন প্রাণের আবেগ, জীবনের ও জগতের অগ্রিবাদী পথ পরিক্রমা।

শ্রীনগরে ঝিলম নদীর বুকে নৌকার ছাদে কবি উপবিষ্ট। দিনের আলো নিবে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। পাহাড়ের সানুদেশে দেবদারু গাছের সারি নিষ্কম্প। চারিদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। বিশ্বচরাচর যেন মৌন বিস্ময়ে কিসের অপেক্ষায় তন্ময়। অকস্মাৎ সেই নিশ্ছিদ্র নীরবতা ডানার শব্দে খান্ খান্ করে ভেঙে দিয়ে উড়ে গেল একঝাঁক হংসবলাকা :

সহসা শুনিনু সেইক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সররমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।
মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি

মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।'

প্রকৃতির শাসরুদ্ধ স্তব্ধতার মধ্যে আলো আর আঁধারের নিবিড় সন্ধিক্ষণে হংসবলাকার পাখার চঞ্চল গতিবেগ যেন বিশ্বের প্রাণের গভীরে প্রতিধ্বনি তোলে। কবির অনুভূতি প্রবলবেগে আলোড়িত হয়ে ওঠে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ (Bergson) গতিতত্ত্বের পরিণতি দেখতে পাননি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রচ্ছায়ায় লালিত রবীন্দ্র-মনীষায় জীবনের পরিণতি এক অনন্ত অসীমের মধ্যে বিলয়— এই সত্য গভীর প্রত্যয়ীভূত। তাই স্রোতস্বিনী গতিময়ী নদী কবির চৈতন্যে 'ভৈরবী' 'বৈরাগিনী।' ভৈরবী ও বৈরাগিনীদের যেমন সংসারের প্রতি কোন মোহ থাকে না, জীবনের কোন সঞ্চয় থাকে না—নদীও তার চলার পথে কিছু সঞ্চয় করে না, রিক্ত হাতে ছুটে চলে অসীমে বিলীন হবে বলে।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী,
শব্দহীন সুর
অন্তহীন দূরে
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল

গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে
বারম্বার ঝ'রে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওনা কিছু, করোনা সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

কালের অখণ্ড প্রবাহকে অবলম্বন করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিশাল সৃষ্টিস্রোত অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে। এই স্রোতের আবর্তে কত গ্রহ-নক্ষত্র জ্বলে ওঠে, নিবে যায়, পৃথিবীর বুকে কত দেশ, রাজ্য, রাজধানী, কত জাতি, ধর্ম, সভ্যতার জন্ম হয়, মৃত্যু হয়। সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে প্রবহমান চির-পরিবর্তনশীল এই কালপ্রবাহই কবির দার্শনিক অনুভবে বিরাট নদী, অনন্ত অভিসারিকা। তার অভিসারে চলার আবেগে বুকের সাতনরী হার ছিন্ন হয়ে যায়, মণি ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত, তার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি অন্ধকার নামিয়ে আনে বিশ্ব-চরাচরে। শোকহীন, দুঃখহীন, ভয়ংকর অনাশক্ত, সুদূরের প্রতি ধাবমান গতিপ্রবাহ কবির ব্যক্তি সত্তাকে সচকিত করে তোলে। কত জন্ম জন্মান্তর, রূপ রূপান্তরের মধ্যে তাঁর প্রাণের যাত্রা—। সীমাহীন গতির আবর্তে কবি তাঁর ব্যক্তি অস্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করেন ঃ

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
কংকার মুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রণরণি।
নাহি জানে কেউ—

রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে
গান হতে গানে।
ওরে দেখ্, সেই স্রোত হয়েছে মুখর
তরণী কাঁপিছে থর থর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাসনে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে— অকূল আলোতে।

মহাকালস্রোতের অতল আঁধারে জীবনের লয় সত্য হয়ে দেখা দেয় কবির অনুভবে। দেহান্তরিত আপন পত্নীর ছবির সম্মুখে মনে হয়—

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির- অন্তঃপুরে ?
এই ধূলি

ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে.
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন,
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি ।

কিন্তু তাই কি ? ভাবনা-কুঞ্চিত কবির প্রশস্ত ললাট। রেখার বন্ধনে মানুষের প্রতিকৃতিই কি জীবনের সর্বশেষ কথা ? নয়ন সম্মুখে যে নেই—সে কি কোথাও থাকে না ? জীবনের গতিপথে যার পরিচয়, নতুন রূপে, নতুন ভাবে ভাষায়, প্রেমে ভালবাসায় গভীর বন্ধনে যার ইতিহাস ; সেতো লয়হীন—সমাপ্তিহীন। প্রত্যক্ষ চেতনায় তার অবস্থান না থাকলেও কবির মগ্নচৈতন্যে—তাঁর অনুভূতির গভীরে সে নিরন্তর নিদ্রাহীন প্রেরণা জোগায়। সেই প্রেরণার উৎস থেকে উঠে আসা গতিশীলতাই কী আসল সত্য নয় ?

কী প্রলাপ কহে কবি ?
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি ।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে ?
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন ।
তোমার চিকন

চিকুরের ছায়াখানি বিম্ব হতে যদি মিলাইত

একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মরমুখর ছায়া মাধবী বনের
হ'ত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিঃশ্বাসবায় করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরে দেয় সুর
ভুলে থাকা নয় সেতো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয় মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

সম্রাট শাজাহানও রেবার বন্ধনে ভালবাসার অমরত্ব চেয়েছিলেন। তাজমহলের শ্বেতমর্মরে যুগ যুগ ধরে পত্নীর প্রতি ভালবাসা বিঘোষিত রাখতে চেয়েছিলেন – ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে ;
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নবমেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে—
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী;
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।

সর্বগ্রাসী মহাকালকে ফাঁকি দিয়ে শাজাহান তাজমহলের প্রতিটি শ্বেত-প্রস্তর কণিকার মাধ্যমে জগতকে শোনাতে চেয়েছেন যে তিনি তাঁর প্রেয়সীকে

ভোলেনানি। কিন্তু বাস্তবিকই তাই? কে সে শাজাহান? অর্থ আর জনবলে বলীয়ান সম্রাট তাজের মত দুর্লভ স্মৃতিসৌধ রচনা করতে পারেন বলেই কি ভালবাসা অক্ষয় হয়ে যায়? জীবন তো চিরপান্থ। সম্রাট হলেও শাজাহানের প্রকৃত স্বরূপ হলো নিরাশক্ত এক অনন্ত পথযাত্রী। জন্মের বিশেষ রূপে বা সীমার মধ্যে সাময়িক আবদ্ধ থাকলেও মৃত্যু তাকে চিরন্তন স্বরূপে নিয়ে যায়। সীমায়িত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, ধনৈশ্বর্য কোন কিছুর সঙ্গেই চিরকালীন সম্পর্ক থাকে না—সমস্ত সঞ্চয় পড়ে থাকে পেছনে—চিরপান্থ যাত্রা করে অজানার আহ্বানে বিশ্ব গতিপথে—লোকলোকান্তরে।

সমাধি মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখি ঢাকি।
জীবনের কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোন মহারাজ্য কোনদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে
তাই এ ধরারে
জীবন উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার

বারম্বার।

তাই

চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

বিশ্ব-প্রকৃতির এই দুর্নিবার গতির সাথে মানুষের একান্ত আপন জীবনের গতির বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য অনুভব করেন কবি। জগতের অবিরাম ধারার সাথে ভেসে যায় জীবনের ধারা। এই আবর্তে মানুষের কত রূপান্তর, কত পরিবর্তন, কত নতুন অবস্থার উদ্ভব ও বিলয়। সৃষ্টির সাথে চলে ধ্বংসের সহাবস্থান— প্রতিপদে, প্রতিক্ষণে :

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই ;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন,
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন ;
এ জীবন
সতর্ক-বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
রুদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, পঙ্কক্লেদে।
যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—

চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে ?
আমিতো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রবনা ঘরের কোনে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।
ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

কবে কখন এই যাত্রার শুরু আর কখন তার শেষ কে জানে! শুধু চলা আর চলা। চরৈবেতি। সীমানার বাঁধন ভেঙে উত্তাল, দুর্বার বেগে শুধু ছুটে চলা, উদ্দাম—উধাও :

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তারপরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তারপরে তার খবর কী যে রাখিনে তার ধার গো—
তারপরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।
আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ।
সেই তো বাধায়, সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধক্কা—
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।
অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাইতো মুক্তি,

তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয়।
মানেনা সে বুদ্ধিসুদ্ধি, বৃদ্ধজনার যুক্তি—
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার সুক্তি।
ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে,
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে।
ফিরবে না রে. ফিরবে না আর, ফিরবে না —
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে—
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে।

চিরপান্থ জীবনের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা যেমন সত্য তেমনি এই লীলাচঞ্চল ধরিত্রীর সাথে মানুষের আজন্ম সখ্যতাও চিরসত্য। ধরিত্রীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে মানুষ মুগ্ধ, জীবন ভরপুর ; সৃষ্টির রসবৈচিত্র্যের সঙ্গে সে একান্ত সম্পৃক্ত, এই ধূলিধূসরিত মাটির পৃথিবী থেকে বিদায়ের কথা মনে হলেই তার অন্তরাত্মা আকুতি জানায় 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' ধরিত্রী তার সকল মায়া ও মাধ্যাকর্ষণে 'যেতে নাহি দিব' বলে যতই বেঁধে রাখার চেষ্টা করুক—একদিন অবশেষে যেতে দিতে হয়, একদিন সব মায়া ছিন্ন করে চলে যেতে হয়। বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের এই যে নিবিড় সম্পর্ক—এও সত্য। জীবন মৃত্যুর বিপরীত মেরুর এই দুই মহান সত্যের মধ্যে কি কোন যোগসূত্র নেই ? কবির দার্শনিক উপলব্ধিতে সেই যোগসূত্র গভীর প্রত্যয়ে চিরন্তন মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। গতিচঞ্চল 'বলাকার সেটাই সারসত্য। বলাকা'র সেই সার-কথাটি আমাদেরও শেষকথা।

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।

ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।
তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবেনা
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী কবেনা তার রহস্যবারতা—
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।
এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেইমত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল ;
নাহিলে নিখিল
এতোবড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো। □

□ এই আলেখ্যটি অনুমতি ছাড়াই উপস্থাপন করা যাবে। শুধু অবগতির জন্য লেখককে এই পত্রিকার ঠিকানায় জানালেই চলবে।

□ যাঁরা গান সহযোগে উপস্থাপিত করতে চান তাঁরা যোগাযোগ করলে লেখক গানের নির্বাচনও সংস্থাপনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক গানের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো : আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী □ এবার আমায় ডাকলে দূরে □ দূরে কোথায় দূরে দূরে □ আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি □ জানি জানি গো দিন যাবে □ তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে □ বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা □ কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে □ যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন □ ওরে মাঝি ওরে আমার মানব জন্ম তরীর মাঝি □ জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে □ হে মহাজীবন হে মহামরণ □ আছে দুঃখ আছে মৃত্যু।

● গল্প

পদ্য হাওয়া

বিষ্ণু বিশ্বাস

বাড়ী আমার ভাঙন ধরা অজয় নদের বাঁকে / জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে / জলচরের মেলা সামনে ধূসর বেলা / সুদূর গাঁয়ের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে। ছেলেবেলায় মুখস্ত করা পদ্যর হাওয়া সিঙ্কেশ্বরীতলা প্রাইমারির চারকোণ জুড়ে থাকা আকন্দ আর ভাট পিটিলির জঙ্গল থেকে ছাড়া পেয়ে নির্মল বাতাসের মতো চোখে মুখে ঝাপটা মারে সুকুমার হালদারের। পদ্যর অক্সিজেন শ্বাসভরে টেনে নিতে অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, আহ্। তারপরই হঠাৎ করে মনে পড়ে কতদিন পদ্য পড়া হয় নি। সংসারের হাজার রকম গিটকিরি আর সরকারী অফিসের নিরন্তর খেঁচুনি সামলে পদ্যচর্চার নিভাঁজ অবসর সুকুমার হালদারের ধূসর জীবনে কোনদিনই আসেনি। আসেনি তো আসেনি—সেজন্য কোনরকম ক্ষোভ বা অনুশোচনা ছিল না মোটেও। কিন্তু কে জানতো পদ্যর হঠাৎ হাওয়া এলোমেলো বয়ে কাঁপিয়ে দেবে অফিসের নোট রিপোর্ট সারকুলার আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজপাগল হেডক্লার্কের মনের ভেতর অজান্তে বয়ে চলা টলটলে নদীকিনারে বাঁধা নৌকাটি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হেডক্লার্কের কাজের কী আর অন্ত আছে! একটু দেরী করে অফিসে আসেন বটে কিন্তু চেয়ারে একবার বসলে আর কোনো হুঁশ থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে যাওয়াটা একটু বেড়েছে। তাছাড়া মাঝে মধ্যেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অর্থাৎ এ. ও. সাহেব ডেকে পাঠান। সেটার অবশ্য কোনো নিয়মবাঁধা হিসাব নেই —সাতদিনে একবারও হয় আবার একদিনে সাতবারও হয়। সাহেব ডাকলে বিরক্ত হওয়া চলে না। একই জিনিস সাতাশ বার এক্সপ্লেন করতে হলেও কিছু করার নেই। সেকশানের লোকেরা অবশ্য তাকে খুবই ভালবাসেন আবার কখনো কখনো ঠাট্টা ইয়ার্কিও চলে। ফাইল থেকে মুখ না তুলেই সেসব উপভোগ করেন সুকুমারবাবু।

অন্য দিনের মতো আজও চেয়ারে বসেই কাজে ডুবে ছিলেন—অভ্যাসমতো

আড়চোখে খেয়াল রাখছিলেন সেকশানের গতিবিধির উপর। একটা ঝকঝকে মলাটের ম্যাগাজিন নিয়ে সবাই টানাটানি করছে দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন সিনেমার পত্রিকাটত্রিকা হবে বোধহয়। সেকশানে কোনো আলোচনাই বাদ যায় না—বিশ্ব অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ, লালুপ্রসাদের বক্তৃতা আর শেয়ালদা লাইনে রেলের লোকদের কর্তব্যে গাফিলতি সবই অক্লেশে উঠে আসে। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় বেতন কমিশনের সম্ভাব্য রিপোর্ট আর শারুখ খানের ঝাড়পিট কিম্বা মমতা কুলকার্ণির গুরুতর পরিসংখ্যান ও ইত্যাদি ইত্যাদি। স্টাফ প্রপোজাল সিট থেকে বন্দনা সেন গলা তুললেন, এবারের দেশ দেখেছেন বড়বাবু? সুকুমার হালদার চোখ তুললেন— ভাবলেশহীন চোখ। দেশ! এবারেরর দেশ! জরুরী একটা নোট এক্ষুনি পাঠাতে হবে এ. ও. সাহেবের থ্রুতে বড়সাহেবের অ্যাপ্রুভালের জন্যে। মাথার মধ্যে একটা যুৎসই ইংরিজি প্রতিশব্দ ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। অ্যাপাততঃ সেই উদ্দেশেই জাল বিছিয়ে সযত্নে গুটিয়ে আনার কাজে ব্যস্ত। বন্দনা সেনের মুখের দিকে আনমনা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, নাহ্। নাতো।—আরেব্বাস। করেন কি সারাদিন? চাকরী তো গেল আপনার। বাজেট সীট থেকে গুপ্ত চেঁচান।

নাঃ, এরা এখন আর কাজ করতে দেবে না। জরুরী নোটটা ফার্স্ট হাফেই সাবমিট করতে হতো। যাকগে—কলমটা বন্ধ করে সুকুমারবাবু গুপ্তর দিকে ফিরলেন। গুপ্ত আরো কিছু বলার আগে আবার স্টাফ প্রপোজালের গলায় লঘু উচ্ছ্বাস। 'এবারের দেশে বড় সাহেবের কবিতা বেরিয়েছে, শুনছেন? সারাদিন শুধু কাজ করলেই হবে? কবিতা টবিতাও একটু আধটু পড়তে হবে তো—নাকি?'

বাজেট আর একটু উর্ধমুখী। 'তার ওপর বড়সাহেব বলে কথা। আমাদের আর কী? আপনাকেই মাঝে মাঝে বড় সাহেবের ঘরে যেতে হয়। বলা যায়না কোনদিন হয়তো এই কবিতার প্রসঙ্গই উঠল। অল ইণ্ডিয়া ক্যাডারের চোখ পাকা জরুরী। ঠিক টের পেয়ে যাবে কী আকাটের বড়বাবু আপনি। সি. আর. এর বারোটা বেজে দশ। এই যে সারাটা দিন খুচুর খুচুর করে নোট লিখছেন কোন কম্মে লাগবে তখন!'

আর সেই মুহূর্তেই এক ঝিমচে ঠাণ্ডা বাতাস অনেক কিছুর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সুকুমার হালদারের ডানদিকের জানালা খুঁজে পেয়েছিল। নোটসীটের কাগজ, আর মাথার চুলে যে সামান্য কয়েক গাছা এখনও অবশিষ্ট আছে তাতে অল্প

কাঁপন ধরিয়ে আরো উত্তরে মিলিয়ে যাওয়ার আগে বড় সাহেবের মুখ ভেসে আসে। কতই বা আর বয়স, রেণুর থেকে দু'চার বছর বড় হবে মেরে কেটে। বুকে পিঠে করে মানুষ করতে করতে রেণুটা আজ বাইশ বছরের যুবতী হয়ে গেল। কদ্দিনের কথা—কোলকাতায় সেদিন অঝোর বৃষ্টি। ছাড়বার নামগন্ধ নেই। কারেন্সি বিলডিং-এর নিচটায় এক হাঁটুর ওপর জল। এল. ডি. ক্লার্ক হিসাবে তখন পেনশন সেলে পোস্টিং। পেনশন সেল ফাঁকা ধুধু। দুপুরের পর থেকে কাটা শুরু হয়েছে গতিক সুবিধার নয় আঁচ পেয়ে। বিল সেকশনের দয়ানিধি বলেছিল, আর দেরি কোরনা হালদার। কারশেডে জল জমে ট্রেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তার ওপর বৌএর ঐ শরীর। সেদিন অকালে নেমে আসা সন্ধ্যায় আধো অন্ধকারে বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার গলির মুখে বাবা হওয়ার প্রথম খবর পেয়েছিলেন। সেই রেণু আজ এত বড় হয়ে গেল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় এম- এ পড়ছে। আরেক ঝটকা ঠান্ডা হাওয়া জানলা দিয়ে এসে সুকুমারবাবুর জামার কলারে চোখের পাতায় আর টেবিলের ওপর রাখা অর্ধসমাপ্ত নোট সীটের ওপর বারকয়েক ঘুরপাক মেরে নাচতে নাচতে উত্তরে চলে গেল। বড় সাহেবের দুই চোখের মাঝামাঝি জায়গায় রেণুর আদল বিন্দুর থেকে বড় হতে হতে আকাশ জুড়ে নিচ্ছে এখন।

আগের বড়সাহেব ট্রান্সফার হয়ে গেলেন মাস দুয়েক হলো। তিনি ছিলেন জাত সাহেব যাকে বলে তাই। একবার ডেকে পাঠালে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে যেত। তার ওপর সুকুমার বাবুর রক্ষণভাগের বড় দুর্বল জায়গা হলো ইংরিজি। লেখার সময় যা হোক করে তবু চালিয়ে নেন। কিন্তু বলতে গিয়ে শুধু হাতড়াতে হয়। দরকারের সময় চেনা জানা ইংরিজিগুলিও পেটে আসে তো মুখে আসে না। আর বড় সাহেবরা ইংরিজি ছাড়া টুঁ শব্দ করেন না। এ. ও. সেনশর্মা সাহেব ইংরিজিটি বলেন কয়েন ভাল। হলে কি হবে, বড়ঘর থেকে ডাক আসামাত্তর সুকুমারবাবুকে ডেকে পাঠান। 'যান সাহেব কোয়েরি করেছেন এক্সপ্লেন করে আসুন।' যতটা পারেন বড় ঘর এড়িয়ে যান এ. ও. সাহেব। অগত্যা সামনে স্যার, পেছনে স্যার আর মধ্যিখানে কাটা কাটা ইংরিজি শব্দে বাঙলা আর হিন্দীর ভুল মিলিয়ে কোনরকমে দাঁড় করিয়ে হাঁপানি গোপন রাখতে হতো। রেণু একবার একটা পদ্য শুনিয়েছিল 'সাগর যেখানে গভীর সেখানে ঢেউ কি কখনো উদ্ধত ?' বড় সাহেবের মুখ যেন গভীর সমুদ্র। প্রসন্ন হলেন কি হলেন না কিছু বোঝা দুষ্কর। সবটুকু শোনার পর গম্ভীর মুখে বলতেন,

ইয়েস ইউ মে গো নাউ। পরদিন ফাইল ফেরৎ আসতো উইথ লাল কালির রিমার্ক। নতুন বড়সাহেব একেবারে আলাদা। হাবে ভাবে চলনে বলনে অবিকল রেণু। সে সব কথা অফিসে বলা যায় না। শুধু একদিন বলে ফেলে ছিলেন, আমাদের নতুন বড়সাহেব মানুষটা কিন্তু ভারী চমৎকার। ব্যস্ হয়ে গেল। গুপ্ত ডান হাতটা মুঠো করে বার তিনেক ঝাঁকিয়ে বললেন, আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। দুদিন যাক তারপর বাঁশ দেবে। সাহেব সব সমান—সাদাসাহেব, বাদামী সাহেব, কেলটু সাহেব বাইরেটাই যা তফাৎ, ভেতর সব এক। বন্দনা সেন সবে গন্ধমশলা গালে দিয়েছেন। জিভ দিয়ে মশলা সামলে বললেন, শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস পড়েন নি বড়বাবু? শ্রেণী হ'ল গিয়ে দুটো। সাহেব আর দাস। বুঝলেন কিনা?

অত বোঝাবুঝির ঠ্যাকা পড়েনি সুকুমারবাবুর। শ্রেণী দুটোই হোক আর চোদ্দটা হোক তার কী? অফিসে আসেন, কাজ করেন, মাইনে পান। কেউ কোনদিন বলতে পারল না বড়বাবু কাজে ভয় পান। নতুন বড়সাহেবকে ভাল লাগে— মিটে গেল ব্যস্। অত সাততালাশে দরকারটা কী!

প্রথম যেদিন নতুন বড়সাহেবের ঘরে যেতে হয়েছিল মনে মনে ইংরিজি মকসো করেছিলেন সেক্রেটারীর ঘরের সোফায় বসে। ডাক আসতেই উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হাঁটুটা একটু কেঁপে গেল। বড়সাহেবের মুখে নারকোল গাছের পাতায় লেগে থাকা পৌষমাসের রোদ্দুরের মতো এক চিলতে হাসি। 'আপনিই অ্যাডমিনি-স্ট্রেশনের হেডক্লার্ক? আচ্ছা আচ্ছা বসুন। সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন বসবার জন্য। বসবেন কী! সুকুমারবাবুর নীচের ঠোঁটটি ঝুলে রইল প্রায় আধ মিনিট। বুকপকেটের নীচে হৃৎপিন্ড দড়াশ দড়াশ করছিল। বড়সাহেবের মুখ থেকে হাসি ততক্ষণে মুছে গিয়ে শুধু রেশটুকু রয়ে গেছে। চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সুকুমারবাবুর দিকে ফিরতেই আগের রোদ্দুরের মতো লেগে থাকা হাসি ফিরে এল, কী হ'ল বড়বাবু? বসুন। সুকুমারবাবু বসলেন। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সেই মুহূর্তে অন্যরকম অনুভবে গা ছমছম করে উঠল। নিস্পাড়ে চেয়ারে বসে বড়সাহেবের সামনে ফাইল মেলে ধরে একদমে বলে যেতে লাগলেন, 'অ্যামাউন্ট অফ রুপিজ সিক্সটি টু পয়েন্ট ফোর জিরো থাউজেন্ড ইনফারড অন অ্যাকাউন্ট অফ···। বড়সাহেব ফাইলের ওপর আর একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান। অত গড়গড় করে বলে গেলে বুঝতে পারি? একটু ধরে বলুন।

তারপরে আরো দুতিনবার ডাক পড়েছে বড়ঘর থেকে। এখন আর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকতে গিয়ে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে যায় না। কোয়েরি করলে গেজির মধ্যে কুল কুল করে অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হয় না। এখন সময় নিয়ে মাথা খাটিয়ে বোঝানোর আস্বাদ অনুভব করেন। নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে অনুচ্চস্বরে কয়েকবার বড়সাহেবের যুক্তিকে খণ্ডন করতেও পেরেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড়সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে শেষে সায় দিয়েছেন, ও আচ্ছা। তাই বলুন। দেখুন তো এই সোজা জিনিষটা এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকছিল না।

ইদানিং এ. ও. সেনশর্মা ঘন ঘন বড় সাহেবের চেম্বারে যাচ্ছেন। সুকুমার বাবুর কাছ থেকে মোটামুটি বুঝে নিয়ে ফাইল বগলে প্রায় নাচতে নাচতে চলেন। পিছনে সুকুমারবাবুকে দেখে সন্দেহের চোখে তাকান। 'কি ? আপনি আবার যাবেন নাকি ? কোন দরকার নেই। ওসব সাহেব সুবোদের ব্যাপার—মেজাজ বোঝা দায়। কখন বলে বসবেন, হু আর দিস ফেলো ? আমিও অপ্রস্তুত হবো আর আপনারই বেইজ্জৎ। তার চেয়ে সেকসনে গিয়ে আরাম করুন।' সেকশানের দিকেই যাচ্ছিলেন সুকুমারবাবু। এ. ও, সাহেবের কথায় হাঁটা ভুলে দাঁড়িয়ে পড়েন।

অফিস থেকে ফিরে চা মুড়ি খেতে খেতে সুকুমারবাবু মেয়েকে বললেন, হ্যাঁরে রেণু—এবারের দেশ পড়েছিস ? রেণু কি একটা কাজে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। বাবার মুখে আচমকা সাহিত্য পত্রিকার কথা শুনে থমকে দাঁড়ায়। কপালের পাশ দিয়ে নেমে আসা চুর্ণ চুল আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, ব্যাপারটা কী বলো তো আগে ? হঠাৎ সাহিত্য নিয়ে খোঁজ খবর করছো ?

আমাদের নতুন বড় সাহেবরে। তোকে বলছিলাম না ভীষণ ভালোমানুষ। আবার পদ্য লেখেন। এবারের দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। অফিসে তো তাই নিয়ে খুব আলোচনা চারদিকে। রেণুর বড় বড় চোখ হঠাৎ ছোট হয়ে আসে। তারপর ডান হাতের তর্জনী দুই ঠোঁটের মাঝে লম্বভাবে রেখে বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও। কী নাম বলতো তোমাদের বড় সাহেবের ?

—মৃন্ময় সেনগুপ্ত। কত আর বয়েস ! এই ধর তোদের থেকে তিন চার বছর বড় হবে আর কী।

রেণুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাই বলো। আধুনিক কবিদের মধ্যে মৃন্ময়দা যথেষ্ট সাড়া জাগানো নাম। তার কবিতার একটা নিজস্ব ভাষা আছে।

নিজস্ব অবয়ব। কদিন আগে প্রেসিডেন্সীতে একটা সেমিনারে নীরেনবাবু তো মৃন্ময়দার কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

সুকুমারবাবুর খুব ভাল লাগছিল রেণুর কথাগুলি। কত কত বছরের অন্ধকার খানাখন্দ পেরিয়ে আবার তরুলতার ফাঁক দিয়ে সুদূরে গাঁয়ের ঘরগুলি চকিতে দেখা দিয়ে সরে গেল। রাতে খেতে বসে আবার বললেন, তোদের মৃন্ময়দা ঠিক কী লেখেন আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবি রেণু? বন্দনা সেনের কাছ থেকে পত্রিকা চেয়ে নিয়ে পদ্যটা পড়লাম — আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। রেণু কাছে এসে বাবার পিঠে হাত রাখে। সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলে, কবিতা বোঝাও একটা চর্চার ব্যাপার। চর্চা করলেই তুমি পারবে। মল্লিকাদি সেদিন বলছিলেন, অংকে কাঁচা একজনের কাছে হায়ার ম্যাথস্ যেমন দুর্বোধ্য, কবিতার বিশহাত দূরে থাকা পাঠকের কাছে সাম্প্রতিক কবিতাও তেমনি। সুকুমারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন। তারপর নিচুস্বরে বললেন, ও—তা হবে বোধহয়। রেণু চলে যাচ্ছিল। আবার কী মনে করে ফিরে এল।

—তুমি বলছিলে না কী লেখেন? তো এভাবে এককথায় বলা মুশকিল। তবে সাধারণভাবে আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা আর পণ্যসংস্কৃতির দেউলেপনাই তার উপজীব্য। কখনো বিষণ্ণ গভীর, কখনো তীব্র বিদ্রূপে।

বাবা কিছু বুঝতে পারছে না—অনুভব করে হেসে ফেলে রেণু—তারপর ব্যাখ্যা করে—এই যেমন ধরো একটা ঝকঝকে শহর, হোর্ডিং আর নিয়নে ঢাকা পড়ে আছে অসংখ্য ক্লেদ আর গ্লানি; একটা সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট ভিতরে প্রাণহীন পুতুলের মতো নরনারী। তারপর ধরো ভেতরের রুগ্নতাকে চাপা দিয়ে বাগাড়ম্বর আর উপর চালাকি—এইসব আর কি!

পরের দিন সকালেই বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন। সুকুমারবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখেন আগে থেকেই সেনশর্মা বসে আছেন। বড়সাহেব একটি ফাইল দেখছিলেন। এক ঝলক দেখে স্মিত হেসে বসতে বলেই আবার ফাইল দেখতে লাগলেন। উল্টো দিকে বসেও ফাইলটি চিনতে অসুবিধে হল না সুকুমারবাবুর। একটি বিশেষ নোট দিয়ে গতকালই ফাইলটি সরাসরি বড়সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ. ও. কে এড়িয়ে এভাবে সরাসরি ফাইল পাঠানো একটু বেশিরকম দুঃসাহস হয়ে গেছে। কিন্তু ঝুঁকিটি অবশেষে নিতেই হয়েছিল। বিষয়টি হলো, রিলিভার না আসা পর্যন্ত দারোয়ানদের ডিউটি চালিয়ে যেতে

হয়। বিকেল গড়াতে না গড়াতে বাবু বিবিরা যেমন ফাইলপত্তর বেঁধে উঠে পড়েন দারোয়ানেরা তা পারেন না। পরের শিফটের দারোয়ানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে তবে রেহাই। কতবার এমন হয়েছে পরপর তিন শিফটে কোন রিলিভার এলো না এবং কর্তব্যরত দারোয়ানকে শুকনো পাউরুটি চিবোতে চিবোতে টানা বত্রিশ ঘন্টা ডিউটি করে যেতে হল। মিশিরজী ধরেছিলেন, হামাদের বেপারডা একটু দেখিয়ে বোড়োবাবু। অল্প চেষ্টা করবে তো জরুর হোয়ে যাবে। সুকুমারবাবু কথা দিয়েছিলেন কিছু অন্ততঃ করবেন। সেইমতো ও.টি-র সুপারিশ করে নোট পাঠিয়েছিলেন। চারদিন পর ছোট ঘর থেকে কল এলো। যেতেই সেনশর্মা খিঁচিয়ে উঠলেন, একটা করে চুল খসছে আর বুদ্ধিও কমছে দেখছি আপনার। গবমেন্ট ও-টি বন্ধ করে দিয়েছে জেনেশুনেও আপনি নোট পাঠালেন? আমি তো আটু হলে সই মেরে দিয়েছিলাম। আমার চাকরিটাই খাবেন দেখছি।

মিনমিন করে সুকুমারবাবু বললেন, পুরোপুরি বন্ধ তো করেনি। রেসট্রিক্ট করেছে। যেখানে না হলেই নয় সেখানে...

—ধ্যার মশায়। যান তো—কাজ না থাকে তো সেকশানে গিয়ে বসে বসে আঙুল চুষুন।

মাস দুয়েক পর আবার মিশিরজী সেলাম দিলেন। সুকুমারবাবু তখনো আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, নিশ্চয় হয়ে যাবে মিশিরজী। এতো জেনুইন কেস। আবার নোট পাঠালেন। এবারে অনারারিয়ম চেয়ে। ছোটঘর থেকে ডাক এল ছদিন পর।

—এটা কী হচ্ছে হালদার?

—কিসের?

ঠোঁটের দুই প্রান্ত কান পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে ভেঙচি কাটলেন সেনশর্মা, কিসের। এমনি হল না আবার উল্টো করে। রেগুলার অ্যাকটিভিটির ওপর কখনো অনারারিয়ম হয়?

—আজ্ঞে রেগুলার অ্যাকটিভিটি তো নয়। এটা একটা একস্ট্রা—এতক্ষণ সিংহের মতো তেজে চেয়ারে টান টান হয়ে বসেছিলেন সেনশর্মা। হঠাৎ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে।

—কী হল, কী হল? একস্ট্রা ইনকাম! সত্যি করে বলুন তো বুকে হাত

দিয়ে, মিশিরের জন্য আপনার এত দরদ উথলে উঠছে কেন ? মিশির হল একটা ক্লাস ফোর স্টাফ—গ্রুপ ডি। ইন্ট্-মিন্টুটা তাহলে কিসের ?

মাস খানেক দম ধরে থাকার পর আবার নোট লিখলেন সুকুমারবাবু। এবার খুব সন্তর্পণে। কোনভাবেই যাতে আর পয়েন্ট না তোলা যায়। স্রেফ টিফিন অ্যালাউন্স প্রতিটি একস্ট্রা শিফটের জন্য সাড়ে বারো টাকা। হোয়াই সাড়ে বারো সেটাও বেশ কায়দা করে জাসটিফাই করলেন। বিনা নোটিশে বাড়ি ফিরতে না পারার জন্য তৈরী খাবার নষ্ট হচ্ছে উপরন্তু অফিস সংলগ্ন মার্কেট থেকে চড়া দামে খাবার কিনতে হচ্ছে—এই হলো গিয়ে সাড়ে পাঁচ প্লাস সাত ইজগাল্ট্ সাড়ে বারো। নোট তো তৈরী হল। তারপর যা করলেন চাকরী জীবনে আগে কোনদিন করেন নি। ঠাকুরের নাম নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সরাসরি বড়সাহেবের ঘরে। যা থাকে কপালে।

বড়সাহেবের উলটো দিকে বসে সুকুমারবাবু আড়চোখে একবার দেখে নিলেন কোনাকুনি বসা সেনশর্মাকে। সেনশর্মা কি এতক্ষণে জেনেছেন ব্যাপারটি ? মনে হচ্ছে না। চোখে মুখে খুব খুশি খুশি ভাব। এক্সিকিউটিভ টেবিলের জলা দিয়ে পা দেখা যায় না। তবু শরীরের উর্ধাঙ্গ যেভাবে তালে তালে দুলছে তাতে সন্দেহ নেই বেশ মৌজে পা নাচাচ্ছেন।

—এবারের দেশে আপনার কবিতা দারুণ লাগল স্যার। আগে শারদীয়াতেও পড়েছি স্যার। আপনার কবিতা পড়লেই কেমন যেন ফিলিংস হয় স্যার। খুবই পবিত্র একটা ফিলিংস—বুঝলেন স্যার।

বড়সাহেব কিছু বললেন না। ফাইল দেখতে দেখতে শুধু একবার হাসলেন। খুব অল্প হাসি। সেনশর্মা আরো কিছু বলার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। ফাইল বন্ধ করে বড়সাহেব সুকুমারবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, এ নোট আপনার ? কাব্যটাব্য মুহূর্ত মধ্যে চটকে গিয়ে সেনশর্মার কপালে আড়াআড়ি চারটে ভাঁজ পড়ল। বড়সাহেবের গলার স্বর একটু যেন অন্যরকম। জড়োসড়ো মেরে সুকুমারবাবু বলার চেষ্টা করলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। প্রথমবার গলাটা তেমন খুলল না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় মোটামুটি স্পষ্ট হল।

—কেন ? টিফিন অ্যালাউন্স কেন ?

টিফিন অ্যালাউন্স দেবার যুক্তিগুলি প্রাণপণে মনে আনার চেষ্টা করলেন। সংকেতের সময় কিছুই এখন মনে পড়ছে না। নোট পাঠিয়ে ভীষণ অন্যায় করে

ফেলেছেন এমন মুখ করে কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, আজ্ঞে মিশিরজী বলছিলেন—। ভ্রু কুঁচকে তাকালেন বড়সাহেব। টিফিন অ্যালাউন্স দিলে টানা ষোলো ঘন্টা ডিউটি করবেন আপনি? কী বলুন, করবেন কিনা?

স্বর বেরলো না সুকুমারবাবুর মুখ দিয়ে। বড়সাহেবের মুখের উপর বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়েই রইলেন। কোঁচকানো ভ্রু স্বাভাবিক হয়ে আবার চেনা মুখটি ফিরে আসছে।

—স্পেশাল অ্যালাউন্সের জন্য নোট দিন। স্পেশাল অ্যালাউন্স ফর একসেস ওয়ার্ক ডিউরিং আন অ্যাভয়ডেবল সারকামস্টানসেস্। এক্ষুনি। এখানে বসেই লিখুন।

সেনশর্মার কপালের ভাঁজ উধাও। মিচকেটা তলে তলে খাল কাটছিল একেবারে টের পাননি। যাক্ এখন অনেক হালকা লাগছে। অধিক বিলম্ব না করে বলে ফেললেন, আমিও তো সেই কথাটাই অ্যাদ্দিন ধরে ওনাকে বলছি স্যার। ক্লাস ফোর স্টাফ বলে যা খুশি তাই করতে পারেন না। ক্যান নট। শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখুন।

সুকুমারবাবু বড়সাহেবের টেবিলে ফাইল রেখে নোট লিখছেন। মিশিরজী-দের স্পেশাল অ্যালাউন্সের নোট। সেনশর্মা ইতিমধ্যে আবার কাব্যের জগতে ফিরে গেছেন।

—মিসেস তো আপনার খুবই ফ্যান স্যার। সব সময় বলে এমন কবিতা আগে কোনদিনই পড়ে নি স্যার।

বড় সাহেব হাসলেন। আগের মতই সেই অল্প হাসি।

—আজকের এই আত্মকেন্দ্রিক সময়ে আপনাদের মতো কবিরাই তো ভরসার বাণী বয়ে নিয়ে আসছেন স্যার। মানুষের গৌরব, মহত্ব এসব উর্ধে তুলে ধরে আপনারাই তো আলোকবর্তিকার মতো আমাদের পথ দেখাচ্ছেন স্যার।

স্বল্প হাসলেন বড়সাহেব আবার। তারপর আচমকা সুকুমারবাবুর দিকে বললেন, আপনি কী বলেন বড়বাবু?

আস্তে মুখ তুলে বড়সাহেবকে দেখলেন সুকুমারবাবু। টেবিলের উপর সশব্দে কলমটি রাখতেই গলায় বেশ জোর এসে গেল। 'শুধু গৌরব আর মহত্ব! ভেতরের রুঢ়তাকে চাপা দেওয়া বাগাড়ম্বর আর উপর চালাকি—এসব

নিয়েও তো ভালো পদ্য লেখা হচ্ছে আজকাল এ. ও. সাহেব ! সুকুমারবাবুকে এই প্রথম প্রত্যয়ী মনে হলো।

বড়সাহেব আবার হাসলেন। এবারে হো হো করে। বড়সাহেবেরা কখনো এতজোরে আর এত সময় ধরে হাসেন না। পাশের ঘর থেকে সেক্রেটারী ছুটে এলেন। সেক্রেটারী আর এ. ও. সাহেব হতভম্ব হয়ে দেখলেন হাসির দমকে বড়সাহেবের গোটা শরীর মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। সুকুমারবাবুর চোখের সামনে সব উধাও হয়ে যাচ্ছে এখন—এই ক্রীম কালার লাগানো ঘর, কার্পেট মোড়া মেঝে, এয়ার কন্ডিশনার, ইন্টারকম, এক্সিকিউটিভ টেবিল। তরুলতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন মাধবী আর মালতীতে ঘেরা এক চিলতে উঠোন। পদ্যর হাওয়া ঝুরঝুর করে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেই উঠোনের সারসার কুমকোলতা। □

With best complements from

A well wisher

R. Krishnan

একুশ শতাব্দী ঠিক সময়ে পেতে হলে
গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়

খুঁজে ফেরা

সুস্মিতা রায়

জনবহুল চৌরঙ্গীর পথে রোজ যদি আপনি যাতায়াত করেন, ছিপছিপে সুশ্রী সুচরিতা সেনকে চোখে পড়বেই। যদিও চোখে পড়ার মত সুন্দরী নয় সে, তবু সকালের হলুদাভ রোদ্দুরে মাথায় একটি রঙিন ছাতা মেলে কোনদিকে না তাকিয়ে সে যখন হেঁটে যায়, একঝলক সুরভির মত তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। কেউ একঝলক চেয়ে ভাবেন, বেশ লাবণ্য মেয়েটির। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা বারমাস নির্দিষ্ট ছুটির দিনটি ছাড়া তার যাওয়া আসার সময়টিও এমনই নির্দিষ্ট যে ঐ সময়ের পথচারী অনেকের সঙ্গেই তার মুখ চেনা হয়ে গেছে। সুচরিতা অবশ্য কখনও কারও সঙ্গে যেচে কথা বলে না, অফিসের সামনে এসে সুন্দর ছাতাটি বন্ধ করে, গরমকালে তার মুখে ছড়িয়ে থাকে অজস্রুচির মত গুঁড়ো ঘাম, শীতের দিনের ক্রীমের ছোঁয়া। সিঁড়ির সামনে কেউ হয়তো বলে, 'মর্নিং মিস সেন— প্রত্যুত্তরে একটু হাসে সুচরিতা, হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় তাকে, তারপর নিজের গন্তব্যে এগিয়ে যায়।

এই অফিসে কেউ কোন কাজকর্মে এলে হয়তো নিজের মনে ভাবে, কোথায় যেন দেখেছি একে বড় চেনা চেনা লাগে, হয়তো একদিন অনিরুদ্ধের বন্ধু প্রণবেশই আসে, কাঁচের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবে, আরে এ সেই সুচরিতা না···

কাউকে দাঁড়াতে দেখলে সুচরিতা মিষ্টি হেসে বলে, কাকে চাইছেন বলুন মিষ্টার রায়···মিষ্টার মালহোত্রা···নাকি মিসেস্ সিন্‌হাকে···সুন্দর আঙুলগুলো টেলিফোনের বাক্সের ওপর নড়াচড়া করে···মাঝে মাঝে ফোন কানে তুলে বলে, হ্যালো···

হঠাৎ একদিন রাস্তায় অনিরুদ্ধকে আবিষ্কার করে প্রণবেশ বলে, বিয়ে করেছিস শুনলাম···তাহলে সেদিন সুচরিতাকে দেখলাম মনে হোল···অনিরুদ্ধ হাসে। গলায় টাই, নিভাঁজ স্যুটে অদেখা ধুলো টোকা দিয়ে ঝেড়ে বলে, বাড়িতে আয়না একদিন, মণিমালা দারুণ চাইনিজ করে—

প্রবেশও হাসে। সুটের আড়ালে অনিরুদ্ধর—মনটা দেখার বৃথা চেষ্টা করে ভাবে, সুচরিতাকে কি সত্যিই ভুলে গেছে সে!

সুচরিতা থাকে বিধাননগর। অনিরুদ্ধ থাকে যাদবপুর। বড় দেরি করে আসার স্বভাব অনিরুদ্ধর, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক একদিন প্রায় চোখে জল এসে যায় সুচরিতার, একটা জায়গায় একটি তরুণী কতক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

অনিরুদ্ধ এলে স্কোডে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে, তুমি এরকম কেন বলোতো! ভুলে যাও রোজ? অনিরুদ্ধ হাসে। নিজের এলোমেলো চুলগুলো দু'হাতে সামলিয়ে বলে, কি অবস্থা বোঝনা বাস-টাসের···

রাগ ভুলে সুচরিতা নিজের ব্যাগ খোলে, এই নাও চিরুণী।

—ভেরি গুড, অনিরুদ্ধ খুশি মনে বলে, তুমি হবে আমার সুগৃহিণী।

—তাই, সুচরিতা ভুরু তোলে, শুধু সুগৃহিণী হতেই তো জন্ম আমাদের।

—তা নয়, অনিরুদ্ধ আড়চোখে তাকিয়ে বলে, রাগলে তোমাকে দারুণ দেখায়।

—অতক্ষণ ওভাবে দাঁড়ানো যায়, সুচরিতা অভিমানী গলায় বলে।

—সত্যি, তখন এত অসহায় দেখায় তোমাকে, আমি না এলে কত লোক যে তোমার সাহায্য করতে ঝাঁপ দিতো।

এরকমই সব কথা···ছোট ছোট—টুকরো টুকরো···তারই মাঝে সবুজ গাছের জাফরির—আড়ালে কমলারঙা সূর্য অস্ত যায়। সেদিকে তাকিয়ে অস্ফুটে দু'জনে বলে, এটা সত্যিই কলকাতা তো!

কলকাতা কলকাতাতেই থাকে। কিন্তু মানুষ বদলে যায়। যে অনিরুদ্ধর চাকরির আশায় অহল্যার মত প্রতীক্ষা ছিলো সুচরিতার সত্যিই একদিন তা হোল। দুরন্ত খুশির ফানুস উড়িয়ে অনিরুদ্ধ বললো, আর ক'টা দিন, তারপর ঐ সূর্যের লাল আভা এবার তোমার সিঁথিতে জ্বলবে। মনে মনে কেঁপে উঠে সুচরিতা বলে, দূর তোমার শুধু ঐ একটাই কথা!

হাজারো কাজের মাঝে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় অনিরুদ্ধ, মাত্র কয়েকটা বছরে হু-হু করে উন্নতির সোপান বেয়ে উঠে এসেছে যে···মনে হয় জিতলো না হারলো কে জানে! মণিমালার সঙ্গে তপ্ত একাগ্র মুহূর্তে হঠাৎ যেন বুকের ভেতরটা শূন্য মনে হয়, এইখানে মাথা রেখে একজন বলেছিল, এই জায়গাটা কিন্তু শুধু আমার, এখানে কারও অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ···এখন সেই বুকে মাথা.

রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মণিমালা, তার সুন্দরী, বিদুষী, পদস্থ চাকুরিয়া স্ত্রী. কেন যেন তার মাথাটা সন্তর্পণে সরিয়ে দেয় অনিরুদ্ধ····আস্তে আস্তে উঠে পড়ে··· এমন কতবার···

অফিসের নতুন বন্ধু সুরঞ্জিৎ বলতো, তোকে দেখে আমার হিংসে হয় অনিরুদ্ধ, সুচরিতার মত মেয়েকে পেলে কেউ অসুখী হবে না। শুনে লজ্জায় লাল হয়ে যেতো সুচরিতা, আর হাতের সিগারেটে টান দিয়ে অনিরুদ্ধ ভাবতো, সত্যিই কি তাই ! মনের গহন কোণে তখন সবে মণিমালার আনাগোনা শুরু হয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে দেরি করে না এসে অনুপস্থিত হতে লাগলো অনিরুদ্ধ····অন্তহীন অপেক্ষায় থাকা সুচরিতা টের পেলো. সে এবার পিছিয়ে পড়ছে। হেরে যাচ্ছে।

এখনও যখন সূর্য অস্ত যায়. অফিস থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকে অনিরুদ্ধ। মণিমালা এখন তার অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে নতুন কোন প্রকল্পের কাজে পার্টিতে গেছে, ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত···হয়তো একটু কিছু খাবে, হয়তো খাবেনা····

—তুমি কিন্তু চাকরি করবে না, সুচরিতাকে বলতো সে।

—চাকরি করতে আমার বয়ে গেছে। আমি দিব্যি বাড়ি বসে খাবো-দাবো, মোটা হবো। এখন রোজ অফিসের কাজ করতে করতে চোখটা মাঝে মাঝে কেমন জ্বালা করে ওঠে সুচরিতার। ভাগ্যিস তবু চাকরিটা পেয়েছিল। নয়তো থাকতো কি নিয়ে···

রাস্তায় কারও দিকে চোখ তুলে তাকায় না সুচরিতা, যদি হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে যায় সেই এলোমেলো চুল, শুধুই দেরি করে আসা ছেলেটির সঙ্গে···অনিরুদ্ধ কিন্তু তাকায়। তার হু-হু করা মন খুঁজতে থাকে সেই মিষ্টি মেয়েটিকে···· হয়তো কখনও চোখে পড়ে যায়, দিনান্তের ম্লান আলো গায়ে মেখে চলে যাচ্ছে সে।

ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারে না অনিরুদ্ধ। অফিসে কখনও-সখনও চেনা কেউ আসে। সুচরিতা তেমনি মিষ্টি হেসে, ফোন কানে তুলে বলে, হ্যালো···· হ্যালো....□

● কবিতা

চাঁদ ওঠে

মূল : ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা
অনুবাদ : মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

যখন চাঁদ ওঠে
মিলিয়ে যায় ঘন্টাধ্বনি
জেগে ওঠে পথগুলি
অগমের।

যখন চাঁদ ওঠে
সমুদ্র ঢাকে পৃথিবী
হৃদয় ভাবে সে যেন
এক দ্বীপ অনন্তে।

কেউ খায় না কমলা
পূর্ণ চাঁদের তলায়।
তখন খেতে হয়
সবুজ আর ঠাণ্ডা ফল।

যখন চাঁদ ওঠে
একরকমের একশো মুখ বেরোয়
রুপোর টাকা
পকেটে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

লেয়েনাডা

(লোপ দে ভেগার সম্মানে)

নদীটির তীর ধরে ধরে
নিজেকে ডুবিয়ে তোলে রাত
লোলিতার বুকের ভেতরে
ডালপালা ভালোবেসে মরে

ডালপালা ভালোবেসে মরে

মার্চের সেতুর ওপরে
রাত তার নগ্ন গান গায়
লোলিতা গা ধোয় নুনজলে
আর সাদা রজনীগন্ধায়

ডালপালা ভালোবেসে মরে

ছাদে ঝিকমিক করুকরুস
মৌরীমদ আর রুপোরাত
রুপো নদী আয়নাটি এবং
ফরসা ওই মৌরীমদ উরু

ডালপালা ভালোবেসে মরে

সমর্পণ মুখোপাধ্যায়ের

নতুন কবিতার বই

ফিরে আসি কোলাহলে

একটি কবিতা সীমান্ত প্রকাশনা

তোমার পিঞ্জরে বাস / তারাপদ আচার্য

কতোদূরে যেতে পারে মানুষ, যখন সে শঠ প্রবঞ্চক।
একবার ভেবে দেখো, যখন তুমি নেই
যখন তোমার নাম মুছে গেছে, যখন আঁধার
ঘিরে নেয় দশদিক, ঘিরে নেয় মুখের আদল
তখন ফেরার পালা, ফিরে দেখো, নদী-সিন্ধু-মরু
জীবন লেহন করে, মৃত্যুর মুকুট পরে বলে :
'তোমাকেই জানি আজ, তুমি সেই নিহিত ত্রিতাল
তোমার পিঞ্জরে বাস, তোমাকে ঠুকরে খাই তবু।'

ও আমার বোকাষষ্ঠী, ও আমার বোকালোক / যশোধরা রায় চৌধুরী

এই আমাদের বোকাষষ্ঠী, বোকালোক, বন্ধুলোক, আমাদের
নিয়ে এত মজা করছ কেন, আমি বাচ্চা মেয়ে, কিচ্ছুই বুঝিনা,
তবু হৃদয় রয়েছে, আহা, যদিও মেয়েরা কবে খুইয়ে এসেছি
সেটা ভগবানও জানে

ও আমার তালেবশা ভাবগ্রাহী শকুন্তলালোক তুমি, তুমি কি
বুঝেছো কেন এত বেশি ছ্যাবলা, শ্রদ্ধাহীন, আর বাড়াবাড়িরকমের
চুলখোলা হয়ে গেছি আমি ? যদি বুঝতে তবে এভাবে বলতে না
আর তাকাতেও অন্য দিক দিয়ে

যার চোখই চলে গেছে তার বুদ্ধি কিবা কিবা অনুভূতি
যার তালু শুষ্ক হয়ে গেছে তার ভালোবাসা, নীরবতা এক
যার কোনো বোকামিও গ্রহণীয় সেই তো আমার, তাই না, শোক ?

নিশ্চিত স্পর্ধা / সমর্পণ মুখোপাধ্যায়

বলি নি তো, আমি পারি আরো অনেক কিছু
যা তুমি পার না।
বলি নি তো, তুমি মেঘে ঢাকা তারা,—অথবা :
আমি ছিন্ন পদ্মদল।
তোমার কারুকার্যময় প্রকৃতি সদাই ভাষ্যমান
আমি পারি না বলতে—
যেটুকু, অসমাপ্ত থাকে তাহাকে চিত্রিত কোরবো
কল্পনা রটাতে।

এইসব দৃশ্যপটে স্বাক্ষর রেখে যেতেও পারি
ক্ষণিকের আড়াল যদি ঢেকে রাখে
নিশ্চিত স্পর্ধা :
উর্বর ভূক্ষেত্রে মন্বন্তরের আগেই, তবে
পুঁতে দেবো বীজ
প্রেমিকের চোখ থেকে শুষে নেবো জল
সিঞ্চিত কোরবো মাটির ফসল।

একটি ব্যর্থ কবিতা / অজয় নাগ

মুকুল ফোটাতে গাছে
সময়ের শিকড় কেটেছি
কাছে আসতে তোমার
দূরে সরে গেছি বার বার
সুখের পালকে ঢেকে দেহমন
দর্শকের দু'চোখ ধাঁধিয়ে
অবশেষে
চমকে উঠি নদীর আয়নায়

মাঘ / অনিন্দ্য রায়

এলোমেলো মাঘমাসে হারিয়েছে
টিয়ার নোলক।
কিংবদন্তির ফোঁটা
হিমের ভেতর ক্রমে
প্রকাশিত হয়।
শিস দিচ্ছে অপরাহ্ণ;
পাখিরা ফিরছে
শুধু ঘাড় উল্টে টিয়া
দেখছে রাত্রির
ফোলানো পকেট।

ঋতু

নিসর্গের মধ্যে ঋতু
নামতে পারে নি;
বাষ্পীভূত হয় পুকুরে পতিত
চাঁদ।
বরফের মূর্তিগুলো গলে গেছে
আমাদের আসার আগেই।
ওপরে ভাসছে নিস্পৃহ এমন ঋতু
খর্জুর গাছগুলো
ছুঁতে পারছে না।
কেবল গুঞ্জনময়
পতঙ্গ উড়ছে।

বাস্তুঘুঘুর গান / পার্থ বসু
(স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে)

ভালো আছি এই কথাটা বলতে ঢাকগুড়গুড়
করি নি কখনো, আমতা আমতা করি না আমরা,
লুকোছাপা নেই, বাড়বাড়ন্ত বাস্তু ঘুঘুর
দিনের আলোর মতন স্পষ্ট, চিকন চামড়া

আরো চেকনাই পেয়েছে যে, আপনারাই তৈল
যোগালেন তাই, এমনি এমনি নইলে কি আর
একয় বছরে এতটুকু থেকে এতোটা হইল
এবং স্বাস্থ্য রাখবো কি করে শিখে হুঁশিয়ার

আমরা এখন ভালো আছি বেশ, সংবদ্ধ,
বক্তৃতা হয় থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় ।
আমরাও টাল সামলাতে শিখে আপাত ভদ্র
সর্বস্তরে মিশে গেছি, সব কিছুর ভিতর ।

গোঁসা নয় দাদা । আমাদের তাই টেনে নিন বুকে
গুঁড়ো পেলে আপনাদেরই সেবক বাস্তুঘুঘুর ।।

ভ্রম / অরিজিত দত্ত

আমাকে জড়িয়ে থাকে
ক্লান্তিহীন পাশ্বজন সখা
চোরাবালি চারিদিকে
বহুবিধ মৃত্যুফাঁদ
নিষ্ঠুর মরু উপত্যকা ।

ভোররাতে স্বপ্নগুলি
করে চলে অলীক নির্মিতি
বাউল নেমেছে পথে
দোতারায় দিয়ে টান
ভুল সুরে গায় চিত্রগীতি ।

কানে আসে আগমনী
বিষণ্ণ ইঙ্গিতবাহী প্রাতে
মেঘমুক্ত নীলাকাশ
তবুও মানুষ মরে
আকস্মিক ক্ষণ বজ্রাঘাতে।

জল ভেঙ্গে দ্রুত পায়ে
প্রান্তর করি অতিক্রম
সন্দেহের কাঁটা বিঁধে
জীবন বিষিয়ে যায়
রঙ্গভূতে হয় সপ্রতিভ।

মুখোশ মানুষ / সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

যে সত্যিকারের বাঘ
সে কখনও মুখোশ পরে না।
তুমি মুখোশ পরেছ কেন ?
যে মানুষ ভাবাতে জানে
সে সটান দাঁড়ায় বনস্পতির মতো।
তুমি দিন দিন বেঁকে যাচ্ছো কেন ?
স্বপ্ন নিয়ে ব্যবসা করে যারা
তারা নিয়ন আলোর নীচে
প্রেমিকার হাত ধরতে লজ্জা পায়।
তুমিও একদিন ভালোবাসতে জানতাম
অথচ আজ প্রেমহীন ধূসর জনপদে
তোমার ধ্বংসস্তূপ দেখেছি।
একদিন তোমার পাশে দাঁড়িয়ে
সূর্যকে নাগালের কাছে মনে হত।
আজ তুমি জনতার আর্তনাদ মাড়িয়ে
চলে যাও শীতল ছায়ার দিকে
রাজা, তুমি কি আমাদের ভয় পাও ?

নির্বাচিত চিঠিপত্র / তাপস রায়

যেভাবে অ্যাজেলিয়া পাপড়ি মাত্র একবারই দীর্ঘ অপেক্ষায়
ফুটে ওঠে আর উমইয়াম্ নদীটিকে বন্ধু মানে, পাহাড়ের ঘেরাটোপ
আমার সমস্ত অক্ষমতা, চৌকাঠ সামনে রেখে একাকী বন্ধু, পাঁজরে থরথর ঘাম
পরণ কথার দিকে কিছু মেঘ রোদ, তাকাও, কিছু পাথর ভাঙা জল
ছুঁয়ে দাও, এই নির্জন উপত্যকায় এলোমেলো বেঁচে আছি

রাত নামে, নিঃসঙ্গতা ফ্লাগ, মনে হ'লো জোনাকীর আলো, রঙ ছোপ
অন্ধ দুরত্বে কিছু চিরকুট, নড়েচড়ে আলোকণা ফুল হয়
প্রিয়জন হাসে, দেখি, এরকম আশ্চর্য তারার কথা আমাদের শোনা

স্বপ্ন সেজে নেয় পাখিরাও চুপ, পাহাড়ী শীতের বুকে নিজস্ব ধার
আর বহুবর্ণ কথকতা সেজে নেয়, চুপ আলপথে ঘুরে এসে
নিজে নিজে কিছুটা প্রস্তুত, আগামী বসন্তে উইলো পাতারা যেন
কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে না পড়ে

মানবিক কথোপকথন / মৃণাল দত্ত

ঈশ্বরের কথা শুনে হা হা
করে হেসে উঠলো শবনম, বললে,
কোথা আছে ঈশ্বর।
বললুম, তাকিয়ে দ্যাখো ঐ বটবৃক্ষতলে :
কালো কুচকুচে পাথর, রক্ত রঞ্জিত, চন্দন চর্চিত,
ঐ তো ঈশ্বর।
শবনমের হাসি থামে না।
ধমকে বললুম, চোখ খুলে দ্যাখো,
বিজ্ঞানকে দূরে ঠেলে নগ্নপদ যুবক-যুবতী চলেছে
বাঁক কাঁধে দূরান্ত থেকে—পাথর স্নাত হবে
বিশ্বাসী ধারাপাতে ; এই তো দ্যাখো না,
পথপার্শ্বে নীলবর্ণ দেবতা বসে আছেন
সস্তুষ্ট নমস্কারে ; কোথাও-বা

স্ফীতবক্ষা নগ্নানারী নরমুণ্ড হাতে—
পদতলে শায়িত পুরুষ।
শবনম হাসি থামালে। গম্ভীর হয়ে বললে,—
এসব ঈশ্বর নয়। এসব অপ্রত্যয়ী
মানুষের হিমায়িত দীর্ঘশ্বাস।

গম্ভীর শবনম তাকালে আকাশের দিকে—
শরতের নীল ওড়নায় অগুন্তি শেফালিকা।
নীচে, ঘনদূর্বাদলে অজস্র শিশিরবিন্দু।
বললে : মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই॥

শিকারী এবং / মানিক বৈদ্য

হানা দেয় বারে বারে
মনের গহনে।
বিষপাত্র হাতে।
কচিকাঁচা নেই কোন বাছ।
গোপনের-ই হন্তার সাজ—

চেনা বড় দায়,
বোধ অসহায়, নিদারুণ পাপ।
হাসির মিশুকে পথ
আতরে ছলাপ।

রাত যেন ছোট হয়ে গেছে
দিন বড় হয়নি তবুও
মাঝখানে আঁধারের চাঁই—
জমাট বাঁধানো।

আলোর পথের অবরোধ
ক্ষনিকের সাধ।
ভেসে যাবে একদিন ঠিক
সময়ের নেই অপরাধ।

লিখি চোখ / সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী

লিখি চোখ, কি ভাব ধারণ করে আছি মোহে
আমাকে দিয়েছ যত নিয়ে গেছ ততোধিক
আজ লিখি পরিত্রাণ. ললাট সীমায় লিখি
ক্ষত চিহ্ন ছিঁড়ে এইবার জেগে ওঠো তুমি
জেগে ওঠো. জাগো, সেই চোখ দৃষ্টি কর দান
সৃষ্টির যন্ত্রণা নিয়ে কষ্ট পাই অবিরাম
গোধূলী নেমেছে দেহে, এ কোন কুঠার হাতে
নিজেকেই ছিঁড়ে ফেলি হাঙরের মত—
কোন স্পর্শে কেঁপে কেঁপে ওঠো তান্ত্রিক আসন
আজ লিখি চোখ, দুই চোখে মায়াবী কাজল
আজ লিখি আঁখি পদ্ম, লিখে রাখি চক্ষুমূল
আলো ও আঁধার দিয়েছ দু'চোখে জন্মভর
হে বৈভব কেন ছুঁয়ে থাক এমনি ললাট
আমি তো সামান্য প্রাণ, একখানি প্রদীপ সম্বল
শূন্য বেদী ছুঁয়ে বসে থাকি কিসের আশায় নিশিদিন
বক্ষে রাখি মূর্তির খোলস যদি দৃষ্টি কর দান ॥

এবং একটি খোলা চিঠি / অরিন্দম দত্ত

তোমার দেওয়া দাগটা আজও পিঠের 'পরে আছে।
শুকিয়ে গেলেই থামচে আবার রক্ত ঝরাই,
কিন্তু আমার হাত পুড়ে যায়
দাঁড়াতে গেলেই পা পুড়ে যায় ;
তোমার দেওয়া গাছটা এখন অনেক বড় ; ফুল ফুটেছে
অবসরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকি —
গাছ দেখিনা গাছটা ঘিরে তোমায় দেখি
দেখতে দেখতে হঠাৎ তুমি শূন্যে উঠে পাক খেয়ে যাও
মাথার পরে পাক খেয়ে যাও
পায়ের নিচে পাক খেয়ে যাও

আমি বলি 'পা ছুতে নেই উঠে দাঁড়াও'
যেইনা বলা ওমনি মাটি দু-ফাক হল
মনের মধ্যে আর একটি মন নিদ্রা গেল
তুমি বললে 'বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে',
সেদিন তোমার দেখেছিলাম বিখ্যাত মুখ,
তুমি বললে 'চিঠি দিও—ঠিক দেবেতো ?
উপরে থাকবে আঁকিবুঁকি চিত্র কলা
নিচে তোমার অগ্নি এবং স্বতস্ত্র জল
মধ্যিখানে তোমার লেখা, যা ইচ্ছা তাই লিখতে পার
তুমি বললে, চিঠি দিও ; ঠিক দেবেতো ?'
আমি বললাম 'কোথায় রেখে যাচ্ছো আমায়
কোথায় মুদ্রা সঠিক ভাবে মূল্য পাবে'
তুমি বললে 'যাওয়ার সময় এমন করে আটকাতে নেই.'

আমি তোমার পথের থেকে সরে দাঁড়ালাম
হারিয়ে গেলাম, দু-পায়েতে মাড়িয়ে গেলাম
তুমি বললে 'চিঠি দিও ; ঠিক দেবেতো ?'

ছায়া—তার চেয়ে বড় / বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিড়ের ভিতর থেকে
সে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল
ঠিক আমার সামনে
এলো-মেলো চুলের নীচে
রুক্ষ ও কঠিন দৃষ্টিতে
ঝলসে ওঠা ঘৃণা

পায়ে কোলাপুরি
পরনে রাফ-এন্ড-টাফের
দোমড়ানো-মোচড়ানো ধূসর ট্রাউজার
ও পাংশু-সাদা টপ

যেমন ভাবে এসেছিল
তেমনই ভাবে ভিড়ে মিশে হারিয়ে গেল
রেপে গেল
তার চেয়েও রুক্ষ
তার চেয়েও কঠিন
এবং তার চেয়েও বড় এক ছায়া ॥

ছিন্ন প্রতিশ্রুতি / দেবাশিস চাকী

জোয়ারের নিচে
চোরা স্রোত নদীর গভীরে
পার হতে চেয়েছিল তরুণ সাঁতারু
লাশ তার নদী নিচে জলজ উদ্ভিদে
প্রসাধনে নরমেদ
সুন্দরীর মুখে চেকনাই
রেনেসাঁর ছিন্ন প্রতিশ্রুতি
মানুষের দেহে মৃত মানুষের ঘ্রাণ
পেটের আগুন নেভে বুকের আগুনে
জন্ম নেয় বহুবর্ণ শিল্পমেলা
কবুতর মেঘের আড়ালে
বিজ্ঞান দর্শন কিনে
পৃথিবীকে পোড়ানো হয়েছে বহুবার
পোড়া দাগ বিশ্ববোধে, মানবিক চেতনায়
পোড়া বুকে শঙ্খ বাজে
যুদ্ধ শঙ্খ বাজবে আবার

বলা তো গেল না / অনিমা মিত্র

রাত্রি এখন গভীর হলে, কবিতার ঈশ্বরী
শোনো, তোমাকে গোপনে বলি
তাঁবুর কানাত ছিড়ে, দেখি চাঁদ দিব্যি হেসে
ঢুকে গেছে মাটির ঢিবি খুঁড়ে। হলুদ গাছে
লটকে আছে ঘুড়ি। আজ তাকে পেয়েও নাগালে

শোনানো হলো না গান, 'আজও তোকে ভালবাসি'।
বলাতো গেল না, 'ওগো তেঁতুলপাতার সুজন,
হাঁড়ি ভেঙে গেছে বলে চোখে এই জল।'
বল রাত্রি বল, কত আর স্বপ্ন দিয়ে নিজেকে ঠকাই

ও আমার ধুর্জটি প্রেম, এ কোন নতুন ছল ?
পায়ের পাতায় মোহকুজ্ঝের শেকড়-বাকল
গোড়ালিতে বাঁধা বাসনা-মল। তবু মেয়ে দু দশক
ধরে নিরন্তর প্রব্রজ্যায় : অনিকেত রৌদ্রজলে
এই তো সে দাঁড়িয়েছে ধ্বংসের কিনারে
ও কীর্তিনাশা জল, তাকে দাও ঘৃণা, প্রতারণা
দাও দুঃখ দুঃখ দাও
সে তো দুঃখ পেতে ভালবাসে।

কল্প কথা / মিহির ঘরামি

খাদ্যনিগমের শস্য অন্য পথে বিলি হয়ে গেলে
অথবা চাতকসারি দৃশ্য হয় রেশনের শপে
দৈনন্দিনতাক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত ঘরে মাথা খুঁড়ে মরে দীর্ঘশ্বাস
আকাশে কুসুম ফোটানোর কল্পকথা
বাসাবাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকে।
একমাত্র কথকতা উইকএণ্ডে, রবিবার জুড়ে
স্বায়ত্ব শাসিত ক্ষুধা, ভাতঘুম সান্ধ্য-শো আঁধার টকিজে।
এ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ব নিয়ন্ত্রিত সংখ্যালঘু সামান্য বলগাতে
পাত্র-মিত্র অংশীদার, অনুগামী অমাত্য, উজির
খরা-মারী অভাব সম্ভূত পরজীবী ক্ষমাহীন তর্জনীর শিথিলতা বুকে।
প্রতীকের সিংহছাপে থাবাপিষ্ট রোগা ও নিরীহ মূক প্রানী
ওষ্ঠাগত আয়ু রাখে কৃতাঞ্জলিমুক্ত মুঠি জুড়ে।

[তরুণ কবি মিহির ঘরামি অসময়ে প্রয়াত হয়েছেন। 'একুশ শতাব্দী'র জন্মক্ষণ থেকেই মিহির তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর অকাল বিয়োগে আমরা স্বজন হারানোর ব্যথায় আক্রান্ত। এখানে তাঁর সুভদ্র সান্নিধ্যকে স্মরণে রেখে 'একুশ শতাব্দী'র পাতা থেকে কবিতাটি পুর্নমুদ্রিত হলো। —সম্পাদক]

● স্মরণের আবরণে

শম্ভু মিত্র

(১৯১৫-১৯৯৭)

কিশলয় সেন

বাঙলা নাট্যজগতের অন্যতম পুরোধাপুরুষ শম্ভু মিত্র চলে গেলেন। গত ১৯শে মে '৯৭ রাত ২-১৫ মিনিটে, ৮২ বছর বয়সে এই বিশাল নাট্যব্যক্তিত্বের জীবনাবসান হয়েছে একান্ত নিভৃতে, সঙ্গোপনে। এ সংবাদ তাঁর দেশবাসী জানতে পারলেন ২০শে মে'-র ভোরের কাগজে। কোন ফুল নয়, মালা নয়, কোন সদনে বা প্রাঙ্গণে শোক প্রকাশের সহারোহে নয় একান্ত আপন 'ইচ্ছায়'—"নীরবে, একটু ভদ্রতার সঙ্গে, সামান্য বেশে, বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে" দেহটা পুড়ে গেল। আমরা শোকাহত হলাম, আশাহত হলাম কিন্তু তাঁর 'ইচ্ছাপত্র'-কে সম্মান না জানিয়ে পারলাম না।

বাঙলা থিয়েটারের শূন্যতার ফাটলা আরও চওড়া হল। এ কয় বছরে আমরা হারিয়েছি তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষের মত নাট্য প্রতিভা। এঁদের সৃষ্টি, স্বকীয়তা, নাট্যবোধ, ব্যক্তিত্বের আলোয় বাঙলার থিয়েটার জগত আলোকিত হয়েছে, আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে সে আলোর স্রোতে অবগাহন করে ধন্য হয়েছি।

বাঙলা থিয়েটারের আজ যে স্ফূর্তি, যে পরিণতমনস্কতা, যে শিল্পচেতনা, যে দায়বদ্ধতা, তার ভিত্তিমূলে ছিল শম্ভু মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিত্বের গভীর উপলব্ধি, প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে স্থির সঙ্কল্প সংগ্রামের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

আমরা ভাগ্যবান—শম্ভু মিত্র-র সেই অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করতে পেরেছি।

প্রগতিশীল সংস্কৃতি জগতে একটা কথা চালু ছিল—'শিল্পকে হতে হবে খাপখোলা তলোয়ারের মত, তবেই অসুন্দর জীবনসৃষ্টির কুটিল ষড়যন্ত্রকে

আঘাতে টুকরো করা সম্ভব'। শম্ভু মিত্র তাঁর জীবনব্যাপী কর্মপ্রয়াসে এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপোসহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর কাছেই আমরা শিখেছি শব্দ উচ্চারণের বিশুদ্ধতার নিরীখ, উচ্চারণের বিভিন্ন মাত্রা প্রয়োগে শব্দের অন্তর্গত অর্থের তাৎপর্য, সঙ্গতি সৃষ্টির পথপন্থা। কণ্ঠের বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনে ধ্বনিমাধুর্যে রূপকল্প রচনার কুৎকৌশল। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এক বিকেলে খোলা মাঠে তাঁর কণ্ঠে 'মধুবংশীর গলি'—স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে। কবিতার কী প্রচণ্ড শক্তি তরুণ বয়সে প্রথম অনুভব করেছিলাম। তারপর ছেঁড়াতার, পথিক, রক্তকরবী, চার অধ্যায়, পুতুলখেলা, বিসর্জন, রাজা, দশচক্র, অয়েদীপউস এমনকি সর্বশেষ মুদ্রারাক্ষস পর্যন্ত মঞ্চাভিনয়ে প্রতিটি চরিত্রই আমাদের বোধবুদ্ধি কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাস্তবতার ওপরের স্তর অতিক্রম করে গভীরে এমন এক ব্যঞ্জনা, বিশ্বাসযোগ্যতা, চরিত্রের বিশ্লেষণ শম্ভু মিত্র উপস্থাপন করেন যে আমরা অভিভূত শ্রদ্ধায় নত হই। এ ভাবেই নিয়ত চর্চার মধ্যদিয়েই শম্ভু মিত্র শিল্পকে করে তুলেছিলেন ক্ষুরধার।

রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় অনুশীলনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় নাটকের একটা নির্দিষ্ট চেহারা, শিল্পকলার স্বকীয় মূল্য, মানবিক আবেদন খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা শম্ভু মিত্র করে গেছেন। রবীন্দ্র নাটক তাঁর হাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রবীন্দ্র নাটক সম্পর্কে নতুন বোধ আমরা লাভ করেছি। শম্ভু মিত্র তাঁর সমগ্র শিল্পীসত্তা দিয়েই তা প্রকাশ করে গেছেন।

শম্ভু মিত্রের নাটক নির্বাচনের মধ্যেও সমাজ মনস্কতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। থিয়েটারের কাজ মানুষকে ঘিরে এখানে ব্যক্তি মানুও আছে আবার সামাজিক মানুষও আছে! সমস্যা, সংকট, ভাবনা আলাদা। কিন্তু বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণকে বাদ দিয়ে নয়। তারই সম্পর্ক নির্ণয় এবং কল্যাণবোধের উদ্বোধন ঘটানোর প্রয়াসই শম্ভু মিত্র করে গেছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। না হলে ছেঁড়াতার, উলুখাগড়া, পথিক, রক্তকরবী, বিসর্জন, পুতুলখেলা, দশচক্র ইত্যাদির মত যুগান্তকারী প্রযোজনাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি।

এই প্রযোজনার প্রশ্নে, তাঁর কল্পনার তিলোত্তমাকে একটু একটু করে রূপদানের প্রশ্নে কোন আপোসের কথা তিনি মানতে চাইতেন না। এই অনমনীয়তাই একদা তাঁকে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করেছিল। তৎকালের

কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখার সেল সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষের রিপোর্টে সে বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। সে বিতর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু সাম্প্রতিক নাট্য প্রযোজনার ধারা, চালচলন লক্ষ্য করলে বোঝা যায় শম্ভু মিত্রের অনুসরণেই তাঁদের সিদ্ধিলাভ ঘটছে এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রযোজনার অধিকাংশই মাঠে ঘাটের উপযোগী নয় বলাই বাহুল্য। এ বিতর্কেরও অবকাশ এখানে নেই। তবে প্রযোজনার মান উন্নয়ণ ও রক্ষার দিকে যত্নবান হওয়াতে বাঙলা থিয়েটারই লাভবান হয়েছে এ অনস্বীকার্য।

শম্ভু মিত্রের স্বপ্ন ছিল 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠার। সে স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে। এটা তো বাস্তব সত্য যে, গত বিশ বছরে কলকাতার বুকে অনেকগুলি নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠেছে। এরই মধ্যে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা কি অসম্ভব ছিল? এর গুরুত্ব কি অস্বীকার করা যায়? শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের জীবন-কালে তাদের সুচিন্তিত যোগ্য পরামর্শ এবং সরকারের সদর্থক আনুকূল্যে অবশ্যই সেটা সম্ভব ছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটেনি। তাই আজকে শম্ভু মিত্রের প্রতিভা, মনীষাকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর স্বপ্নের যথাযথ বাস্তব রূপায়ণ। নিছক শোক প্রকাশ, শূন্যতা পরিপূরণের উচ্ছ্বাস আসল কাজকে সফল না করে দূরে ঠেলে দেয়। □

● বইপত্র

□ হারবার্ট □ নবারুণ ভট্টাচার্য
প্রমা □ তিরিশ টাকা

এ উপন্যাসটির সবচেয়ে বড় জোর হল এর অতিমাত্রায় বাস্তব কাহিনী এবং তার উপস্থাপন রীতি। ন্যারেটিভ গল্প উপন্যাস নিয়ে আমাদের যত আপত্তিই থাক, আসলে, শেষ পর্যন্ত, সব গল্প-উপন্যাসই ন্যারেটিভ। লেখক এবং পাঠক মিলিয়েই কোনও সাহিত্যকর্মের সম্পূর্ণতা যদি বিশ্বাস করা হয়, লেখক যেখানে বর্ণনার লাগাম কষে ধরেন, পাঠককে সেখানে বর্ণনাময় হতে হয় বেশি করে। লেখক যেখানে কথা বসান যথেষ্ট হিসেব করে, পাঠককে সেখানে যথেষ্ট বেশি করেই হতে হয় বেহিসাবী। এই শ্রেণীর লেখককে, চিরাচরিত বর্ণনার সহজ সরল পথ ছেড়ে আখ্যানবস্তুকে অন্যভাবে তুলে ধরতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়,

এগোতে হয় অনেক পরিকল্পনা মাফিক। আর সেই সঙ্গে তারাও একটি অদৃশ্য শর্ত আরোপ করে দেন পাঠকের উপর। তোমাকেও, অন্তত কিঞ্চিৎ, পরিশ্রমী হতে হবে পাঠক। অল্প কথায় এবং আভাসে এখানে অনেক বেশি কথা বলা থাকে, ছবি আঁকা থাকে অনেক বেশি। হারবার্টের সর্বাঙ্গ জোড়া সেই আভাস—সেই ছবি। মাত্র ৫৯ পৃষ্ঠার বইটিতে কত যে চরিত্র এসেছে—ঘটনা ঘটেছে যে কত! অথচ কোথাও তা ভার হয়ে ওঠেনি—কোথাও মনে হয়নি যে এই ক্ষুদ্র আধারে তাদের আঁটছে না। হারবার্টে পাঠককেই বেশি করে ন্যারেটিভ হতে হয়।

হারবার্ট, বলতে গেলে, কি হতে পারত এবং কি হতে হয়েছে এই নিয়েই। 'হারবার্ট সরকার। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। ফর্সা। চোখা, সাহেবি গড়ন। রোগা।' লেখক হারবার্টের 'জন্ম'র স্থানে 'আবির্ভাব' কথাটা ব্যবহার করেছেন সতর্কভাবে। যাইহোক, তার বাবা ললিতকুমার যিনি হারবার্টের জন্মের এক বছরের পরপরেই চলচ্চিত্রের এক ব্যর্থ নায়িকার সঙ্গে দার্জিলিং কার্শিয়াং রুটে জিপ দুর্ঘটনায় মারা যান, লেসলি হাওয়ার্ড মার্কা হলিউডি চেহারার মিল দেখে এইরূপ সাহেবি নাম দিলেন ছেলের। বাবার মৃত্যুর মাস আষ্টেক পরেই, বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মারা যান মা শোভারাণীও। হারবার্ট ক্লাস সিক্সে ওঠার পর আর স্কুলে যায়নি। অর্থাৎ যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাড়িতেই টুকটাক পড়ত। পাড়ার দর্জির দোকানে নিয়মিত বাঙলা কাগজ পড়ত। সেলুনে পড়ত শুকতারা ও নবকল্লোল। হারবার্টের ছন্দজ্ঞান ও উপলব্ধি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছিল। আঠারো বছর বয়সে জ্যাঠাইমার সঙ্গে পুরী গিয়ে 'হারবার্টের কবি-প্রতিভা জাগ্রত হয় ধাপে ধাপে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই পূর্ণতা পেল না। যুদ্ধের বাজারে করা অগাধ অর্থ ললিতকুমার 'ফিল্মে লড়িয়ে' নষ্ট না করলে হারবার্টের জীবন অন্যরকম হত। ফিল্ম—যাকে শিল্পও বলা হয়—নিয়ে আত্মধ্বংসী না হয়ে তিনি জীবনশিল্পী হলে, হারবার্টের জীবন অন্যরকম হত। বদলে তাকে হতে হল পারিবারিক তথা সামাজিক আদর্শহীনতার শিকার। এ এক আশ্চর্য অবস্থা! আদর্শহীনতার কারণে এদের উৎপত্তি আবার চরম নিবৃত্তিও সেই একই কারণে। প্রতি মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে কোথায় চলেছে, অথচ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে সেই অমোঘ পরিণতির দিকে কোন সব অদৃশ্য সুতোর টানে। কী নিরুদ্বিগ্ন, কী অসহায়

ভাবে, কী ভীষণ হতাশার মধ্যে দিয়ে এবং অন্যের করুণার পাত্র হয়ে তাকে বাঁচতে হল এবং হ্যাঁ, মরতেও হল !

আসলে এসব বই তো, ধরে ভাল্লাগে না, সময় কাটে না, এটা যা-হোক বই-পত্তরের পাতা ওল্টানো যাক—এই মানসিকতা থেকে পড়া চলে না। এদের জন্যে বলতে হয়, নাঃ. যে করেই হোক, সময় করে বইটা পড়তেই হবে। হারবার্ট, কমপক্ষে, দ্বিতীয় পাঠ দাবি করতে পারে। প্রথম পাঠ তো যাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে প্রথম পরিচ্ছেদের জট ছাড়াতে ছাড়াতে। এত অ্যালিগরি, এত রূঢ় বাস্তব, এত সুমধুর অথবা ভয়াবহ স্বপ্ন, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ আরও একটু নিবিড়ভাবে অনুভব করতে চাইলে দ্বিতীয় পাঠ অবশ্যই দাবি করতে পারে। বিশেষত, লেখক যখন বলছেন : নব্বইয়ের পর থেকে পৃথিবীতে যে-সব ওল্ট-পাল্ট হয়ে গেল, বা, তার কিছু আগে থেকে, সেইটা আমাকে খুব ভাবিয়েছে, 'হারবার্ট' সেদিক থেকে আমার দার্শনিক অবজারভেশন। বলছেন : যদি লেখার ভিতর দিয়ে সেই সামাজিক রূপান্তর ঘটানো না যায় তাহলে লেখার অর্থ কমে যায়।

তার গদ্য নিরাভরণ, মেদহীন। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই তা কবিতার মাত্রা পেয়েছে দারু ভাবে। আপাত এবং গভীর—এই দুটি স্তরেই ভাষাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিতে পেরেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর লেখার ভঙ্গি নিরাবেগ (কখনও তা কৌতুকপূর্ণও), কিন্তু আমরা বেশ বুঝতে পারি যে ভিতরে ভিতরে আবেগের চোরাস্রোত সর্বদাই বইছে। এই আবেগ জীবনমুখী। আমরা এর সমর্থন আরও ভাল ভাবে পাই লেখকের এই উক্তি থেকে : একদিক থেকে হারবার্ট চরিত্রটির অসহায়তা আমিও বহন করি। সেই অসহায়তাকে সাহিত্যের একটা আকার দিতে চাইছিলাম। আরও একটি কারণে লেখক প্রশংসনীয় তা হল, প্রয়োজনীয় সংযম রক্ষা করা। তিনি বলছেন : যে পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে আমি লিখেছি তাতে যদি আমি বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করতাম তাহলে সে লেখা ছাপানো যেত না। স্ল্যাং ব্যবহার নিয়ে যে প্রশ্ন বারবার উঠেছে সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, সেটা এসেছে পরিস্থিতির প্রয়োজনেই। ভবিষ্যতে প্রয়োজন না হলে, ভাষার ধরণটাও বদলে যাবে।

'মৃতের সহিত কথোপকথন'-এর অফিসে যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের জেরা যত এগোয় তত কী ভীষণ অন্তর্জ্বালায় ছটফট করতে থাকে হারবার্ট ! পাঠক তার অসহায়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। আর তারা চলে যাওয়ার পর তার

দশা দেখে পাঠকের বুক বেদনায় ভেঙে যায় যেন। মনের পর্দায় সেই দৃশ্য অতি ধীরে ধীরে দেখতে থাকলে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

নীতিহীন, আদর্শহীন, চরিত্র খোয়ানো পরিবারের সেইসব পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হারবার্ট শ্রদ্ধা ভালবাসা অনুভব করেছিল তার কৃষ্ণদাদা অর্থাৎ কৃষ্ণলাল ও ভাইপো বিনু অর্থাৎ বিনয়ের প্রতি। তাদের আদর্শগত-প্রাণের জন্যে। আর এক সান্ত্বনার আশ্রয় ছিল তার জ্যাঠাইমা। আর ছিল কিছুদিনের কৈশোর প্রেম—বুকির সঙ্গে। ছাদে। মাঝে আরও বাড়ির ব্যবধান রেখে। তা সেই বুকি, পরবর্তীতে লেডি ডাক্তার-সম্পর্ক পূর্ণতা পেল না। শুধু : বাইরের দেওয়ালে, গলির দিকে যে বন্ধু কাচের জানালা তার ধুলো ময়লায় মুখ ঘষে, ডানা ঝাপটে, একটা পরী ঘরে ঢুকে হারবার্টের কাছে আসার চেষ্টা করছে। তার নীলচে মুখের ভাপ কাচের ওপর পড়ছে। তার চোখের জলে ধুলো ধুয়ে যাচ্ছে।

হারবার্টের 'মৃতের সহিত কথোপকথন' অফিস থেকে সাফল্য নিয়ে বেরিয়েও কিন্তু যুক্তিবাদী সমিতির প্রধান প্রণব ঘোষকে 'কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকতে হয়। বলতে হয় : এক একসময় আই ওয়ান্ডার যে কেন এগুলো লোকে করে! পাঠকও এখানে আশ্চর্য হতে পারেন যে 'যুক্তিবাদী' সমিতির সভ্যদের কি অজানা, লোকে কেন এগুলো করে! এটা নিশ্চিত যে সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চাইলে এবং সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে দিলে, অন্তত কাউকে কাউকে হয়ত এমনভাবে আত্মহত্যা করে শেষ প্রতিশোধ নিতে হয় না এই সামগ্রিক বঞ্চনা ও আদর্শহীনতার (সবাই যে আত্মহত্যাই করে তা অবশ্য নয়। বরং বেশিরভাগই এরা তা করে না। তবু সুস্থ সুন্দর জীবনে তো আর ফেরা হয় না। সেও তো একরকম আত্মহত্যাই)। এই 'জালি ব্যবসা' থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে হারবার্ট যে আকুল ছিল!

নিজেকে একজন র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী মনে করা বিজ্ঞানের ছাত্র নবারুণের লেখালিখি এক সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে। এই প্রশ্ন বারবার তাকে দীর্ণ করে, 'মানুষের এরকম হত্যাকাণ্ডের (একের পর এক বিভিন্ন যুদ্ধ ইত্যাদিতে) পরও শিল্প সাহিত্য নতুন করে কী বলতে পারে?' তিনি জানেন যে এই দ্বন্দ্বের নিরসন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সেই দ্বন্দ্বের ভিতরই, যতটুকু করা সম্ভব, তাঁকে নিজের লেখা নিয়ে কাজ করতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তাঁর কাছে একটা সাংঘাতিক ঘটনা, যে অভিজ্ঞতা তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে। আর সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তিনি 'হারবার্ট' লেখার প্রয়োজন

বোধ করেছিলেন তীব্রভাবে। লেখকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবনত হতে হয় যখন তিনি বলেন : যে ধরনেই লিখি না কেন সেটা শুধু ব্যক্তিগতের কাহিনী যেন না হয়ে ওঠে এবিষয়ে আমাকে সবসময় সাবধান থাকতে হয়। আমি চাই নৈতিকতা, মানবনীতি, অস্তিত্ব—এসব ব্যাপারকে স্পর্শ করছে না যে বিষয়, সে বিষয়ে আমার কোনো উৎসাহ নেই। এর সঙ্গে, আখ্যানের আর একটা দায় আছে বলে তিনি মনে করেন, সেটা হল দলিল তৈরি করা—ডকুমেনটেশন। তাঁর আখ্যানে তিনি যেমন একদিকে গঠনের, স্ট্রাকচারের প্রয়োজন বোধ করেন, তেমনি বিশ্বাস করেন স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োজনীয়তায়।

হারবার্ট যেন শেষ প্রতিবাদ, শেষ ধিক্কার জানিয়ে গেল তার সঙ্গে পুড়তে থাকা তার তোশকের (যা আগে বিনুর ছিল) মধ্যে বিনুর লুকিয়ে রাখা ডিনামাইট স্টিক যখন ক্রিমেটোরিয়ামের ফার্নেস ফাটিয়ে দিল। 'বাওয়াল কেউ থামাতে পারবে না বাবা।···তাহলে আর দেখতে হত না '—হারবার্টের এই কথাগুলো এবং তার মরণযাত্রায় তার সাঙ্গোপাঙ্গদের 'হারবার্ট সরকার যুগ যুগ জীও'—এই ধ্বনি আখ্যানটি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভুলতে দেবে না আমাদের। ভুলতে দেবে না এই কথা-- কখন কোথায়, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে। এর সঙ্গে অর্থবহ হয়ে ওঠে লেখকের এই উক্তি, 'আমার মনে হয়েছে উপন্যাস একটা ধারাবাহিকতায় পৌঁছে শেষ হয়। অর্থাৎ উপন্যাসে সব দরজা বন্ধ হয় না—খোলা থাকে, এর পরও চলবে, কাহিনী চলবে।' □

অরবিন্দ পুরকাইত

□ **সাদা পাতায় দাগ কেটেছি** দিলীপ কুমার মহান্তী
প্রকাশনা : এম ১২ শরৎপল্লী, মেদিনীপুর □ ১৫ টাকা

□ **বাক নদী মায়া জল** / চিত্তরঞ্জন হীরা □
'অতএব' প্রকাশনী, নিমতা□ ২০ টাকা

হয়রহামেশাই সে প্রকৃতপ্রস্তাবে শুদ্ধতম কবিতার দেখা পাব, এমনটা আশা করতেই পারি। পাওয়া বা না পাওয়া সে তো অদৃশ্য শব্দদেবীর কৃপা। তিনি যদি ধরা দেন, তবেই কবিতা। তাহ'লে শব্দকিরাত, তুমি অপেক্ষায় থাক নিবিষ্ট ধ্যানে পবিত্র বুকের রক্তবীজ সাদা পাতায় রেখে। শব্দদেবী এসে বসুক

তোমার সাদা পাতার ওপর। নিঘুম তুমি একটা একটা করে সন্ধ্যা দিয়ে তোমার পছন্দমাফিক শব্দ বসাও বাগদেবীর আঁচল থেকে পদাবলী লিখবে বলে। শুধু তার চলন-বলন, চাল, ঠাট-বাট নিরীক্ষণ কর। এহ বাহ্য। বাণী যদি বরদা না হয় তবে তাকে পায়ে ধরে সাধলেও নয়। তখন তুমি হেরে গিয়ে কাঁদ তাকে না পেয়ে। ও যার হবার, তার এমনিই হয়। কাঁদতে কাঁদতেই একদিন এমনি সে এসে ধরা দেবে। তখন তুমি গীতগোবিন্দর জয়দেব। শ্রী দিলীপ মহাপাত্রীর 'সাদা পাতায় দাগ কেটেছি'র কভারব্যাকে স্বল্পপরিসরে কবি পরিচিতির মাধ্যমে আমরা জানলাম, এটি কবির প্রথম কবিতার বই। জন্মেছেনও কবি সত্তরের দশকে। অতএব আরও অনেকটা পথ পেরোতে হবে কবিতার দীর্ঘরাস্তা ধরে। তবেই তিনি পাঠক হৃদয়ে দাগ কাটবেন গভীর মেধা ও বোধ দিয়ে। সাদা পাতার দাগ হয়ে উঠবে কবিতা ঈশ্বরী।

এত শিগগির কবিতা বই না বের করলেই ছিল ভালো! ৩৮টি কবিতার মধ্যে কোনো কোনো শব্দ আমাদের চকিত ক'রে তোলে। 'তোমাকে চাঁদের গান শোনাবো বলেই / আজ আমি ফুসফুসে বাতাস ভরেছি।' অথবা 'আঁধারের মাঝে এসো আমরা ভাসবো।' প্রান্তরে জ্যোৎস্নায় খেলা করে চিল'। এসব ছেড়েও সম্পূর্ণ আগাগোড়া ভালো লাগে 'নবীনবরণ', 'যে রকম চলছে', 'তোমাকে একটি চিঠি', 'কোথায় গিয়েছিলে শাশ্বতী' এবং 'মেদিনীপুর স্টেশনে'। বাকি সব নিজের ভালো লাগা সুখ দুঃখের আবোল তাবোল।

কবিতা কেমন একি আর বলে বোঝাবার! পাঠক তার অপেরাগ্লাস দিয়ে ঠিকঠাক দেখে নেবে কবিতাশরীর। সঠিক হলেই তারা এসে বসবে কবিতার দাঁড়ে দোল খেতে। ধীরে ধীরে 'বাক নদী মায়া জল' এ আটকে যাবে পা। তখন আর ছাড়ান ছোড়ন নেই। কবির 'বাক নদী মায়াজল' এ আপনি মুগ্ধ, অভিভূত। অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা কবিতায় আপনি, আমি, আমরা বলে ফেলি; তুমি অদ্ভুত সুন্দর! ঢুকে পড়ি কবিতা গ্যালারিতে। ৫১টি শব্দছবি ঘরে আপনি কবিতার ফাঁদে আটকে দিয়ে পা, এবার বলেন 'যা'। আমরা যেতে পারি না, চিত্তরঞ্জন হীরা। ছিলাকাটা শব্দের দ্যুতি আমাদের কবিতার রক্তাক্ত পথ চেনায়। 'নদী বলল,—বিকল্প কিছু খোঁজো / খুঁজতে খুঁজতে একদল মানুষ বৃক্ষের কাছে এল / বিনীত কণ্ঠে বলল—তোমরা আমাদের তেজ দাও / একদিন সব শোধ করে দেব। এ বড় মেধাবী সংযম শিক্ষা তোমার / কঠিন দায় / বসন্ত সংযোগের আগে নিজেকে রেখেছ / ঠিক পাহারায়।' 'পোষালীধান

ভিটের মাটি / শ্যাকরা খেলো একলা ঘরের গয়নাগাটি।' 'যেন অরুণিমা রোজ ভুল করে রাখে বিন্দির টিপ প্রকাণ্ড আড়াল ড্রেসিং টেবিলে।' এমনই সব স্মার্ট ভাষা টানটান এসে দাঁড়ায়। নাম কবিতায় সেই বিদ্যুৎপ্রভা শব্দে। 'সে কী কোনদিন পঞ্চবটী বনে / লুকিয়ে দেখেছে কৃষ্ণগোলাপের স্নান'। এমনই সব অসম্ভব শব্দের গভীর তলে মিশে থাকে কবির কখনও শান্ত ভাব, কখনও বৈষ্ণবীয় ভঙ্গিমা। 'দশচক্রে সঙ্গম, প্রেত, শিৎকার / .... জেগে ওঠে মহাবিদ্যা শ্লোকে।' অদ্ভুত ছন্দে লেখেন (ছড়ার ছন্দ) 'বৃষ্টিরীতি', 'পাতাবাহার'। এবম্বিধ কবিতা সম্ভার কবি উপহার দেন আমাদের। চমৎকৃত পাঠক, 'কবিতা কী' বলে বোঝাতে পারবে না। এটুকু শুধু বলা যায় 'কবিতা এই।'

দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রথমটি কবি দিলীপ মহান্তী তাঁর নিজের প্রচ্ছদ নিজেই করেছেন অত্যন্ত সুচারু অর্থময় রেখাপাতে। ঝকঝকে মুদ্রণ মোলায়েম কাগজে অনবদ্য পরিচ্ছন্ন। কবি চিত্তরঞ্জন হীরার প্রচ্ছদ শিল্পী নিলাদ্রী মজুমদারের মার্জিত সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন রঙের সঙ্গে সুসম।

অনিমা মিত্র

□ **হৃদপিণ্ড শব্দ খোলে** / উমা বন্দ্যোপাধ্যায়
মধ্যদুপুর □ কুড়ি টাকা

□ **কূল কিনারা** / গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুখেন্দু বিকাশ পাল
ঋত্বিক প্রকাশনী □ পনেরো টাকা

পরিচ্ছন্ন সুমুদ্রিত ও সংযত রঙিন প্রচ্ছদযুক্ত মলাটের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে—উমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪২টি ছোট কবিতা। কাব্যগ্রন্থখানির নামকরণ বেশ অর্থবহ। তার সর্বাঙ্গে পরিচ্ছন্ন পরিমিতিযুক্ত সংযম পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগবে। একথা বলতে পেরে যেমন আনন্দিত, ভালো লাগার কথাও অকপটে স্বীকার্য। প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবিতার নিচে প্রয়োজনীয় জায়গা ফাঁকা রেখে পাঠক-পাঠিকাকে চিন্তার যে অবসর দেওয়া হয়েছে, প্রকৃত কবিমানসের পক্ষে তা এক প্রশংসনীয় তাৎপর্যমূলক উল্লেখযোগ্য বিষয়। মনে হয়, তাঁর প্রতিটি কবিতাই উদ্ধৃতিযোগ্য—কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলি। যথা—প্রথম কবিতা 'একাত্মতা' থেকে শেষ কবিতা 'শৃংখলাগা' ইত্যাদি কোনোটিকেই যেন বাদ দেওয়া যায়না—বাদ দিতে মন চায় না। ক্যানভাসে ঘুম, শিব চতুর্দশী, জলের গান, খেলা, রক্তাক্ত ঈশ্বর, আলোকলতা,

ও জলপরী, স্বীকারোক্তি, চাবি, পথের গান, আমার অপেক্ষায় ইত্যাদি কবিতা-গুলি। এবং কবিতাগুলিতে যখন তাঁর "হৃদপিণ্ড শব্দ খোলে"—কবি তখন বেশ স্বচ্ছন্দে লিখে চলেন 'শব্দ' কথা আর প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ, যেমন—

বুকের মধ্যে অনর্গল এক শব্দ সাড়া মেলে
দিন রয়েছে দায়বদ্ধ, ঢেউয়ের পারে ঢেউ।—(আলোক লতা)
মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শব্দ
কার্ণিশে কার্ণিশে জ্যোৎস্না
সে এসে চলে গেছে কিছুক্ষণ হল।—(আসা-যাওয়া)

ঘড়ির কাঁটার শব্দ আঙুলে আঘাত করে
বিদ্ধ হয় হাতের রেখায়।—(হাতঘড়ি)

শব্দ ফোটে আতস বাজি বধির রাতে
প্রতিধ্বনি মাঠে মাঠে অসাড় হাওয়ায়
মাথার উপর সোহাগ বিষের নীলাভ সুখ
আদর রাখে অনুগত মগ্ন জ্বালায়।—(শঙ্খলাগা)

ভালো কবিতার সঙ্গে মনোরম প্রচ্ছদের এমন সুন্দরতর সমাহার ক্রমশ প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। বিশেষত শহরমুখী সভ্যতার যুগে বর্তমান কবি ও শিল্পী উভয়েরই নিবাস শহরতলি এলাকায়। তাই একাধারে এই কবি ও শিল্পী আমাদের সকলেরই মুগ্ধ প্রশংসার পাত্র। আমরা তাঁদের ক্রমশ আরো উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুখেন্দু বিকাশ পাল—এই দুই কবির যৌথ উদ্যোগে যুগলবন্দী কাব্যগ্রন্থ—'কূলকিনারা'—সামনে ও পিছনে—দু'দিক থেকেই শুরু ও মাঝখানে শেষ—মোট ৪৮ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রন্থ—দুই কবির ভাগে সমসংখ্যক অর্থাৎ ২৪+২৪ পৃষ্ঠা বরাদ্দ; একই প্রচ্ছদ উভয়ের স্বাক্ষরসহ দুদিকে মুদ্রিত বোর্ড বাঁধাই যন্ত্র। কবিদ্বয়ের মধ্যে গোবিন্দবাবুর দু'খানি কাব্যগ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত বলে তিনি রয়েছেন অগ্রজের ভূমিকায় এবং সুখেন্দু বিকাশের এই প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, তাই তরুণতর। মোট ২৪ পৃষ্ঠায় তাঁর মোটামুটি নাতিদীর্ঘ ১৮টি কবিতা পুজো থেকে জন্ম পর্যন্ত; সঙ্গে শিরোনামহীন একটি ভূমিকা লিখেছেন—

"কবিতা না ছাই ! কবিতা, গল্প, ছড়া মিলেমিশে কবিতা বা ছবিতা হয়ে গেছে। কবিবন্ধু গোবিন্দদার চাপে পড়ে প্রকাশিত হলো। একটা লাইনও যদি ভুলক্রমে কারো ভালো লাগে !"—এইসঙ্গে তাঁর মনে ক্ষোভ জমে আছে এই পুজোর আনন্দের মাঝে কেন "ওড়িশার উপকূলে হঠাৎ নিম্নচাপের" সৃষ্টি, কেন চারিদিকে হাহাকার "তেল নেই, চাল নেই / নেই কোন জ্বালানীর কাঠ", "কত তাজা প্রাণ হায় / আমাদের ছেড়ে যায়", এবং "কত ঘর ডুবে যায় / ডুবে যায় ডুবে যায় ধানক্ষেত / মরে পশুপাখি শয়ে শয়ে" এবং "লাখে লাখে নরনারী হয়ে রয় জলবন্দী উদ্ধারের কাজ চলে সেথা" সবশেষে "তাদের সে-দুর্দশা / কেমনে জানাই আমি / শুধুই সে বুঝে নাই ব্যথা।"....তাই তো কবির সংগত ও সংযত ক্ষোভের প্রকাশ, যথা—"রাশি রাশি দুঃখ মাঝে / তবুও তো পুজো আসে / ঘটা করে সবে পুজো করে / আমি বলি কেন মিছে / শুধু ছোটা পিছে পিছে / কেন পুজো দেবতার তরে।"—(পুজো)। এরকম সমাজ সচেতন সংযত ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায় তরুণ কবির প্রায় প্রতিটি কবিতায়।

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এখানি তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। মোট ২১টি কবিতার সংগ্রহ। কবিতাগুলি মূলত দৈনন্দিন জীবনের বহিরঙ্গের অতি সাধারণ চিত্র, তা কোনো অন্তর্নিহিত ছবি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়নি,—স্বল্প সংখ্যক সামান্য দু'একটি কবিতা ছাড়া ; যথা—মৃত্যুঞ্জয়ী, জীবনের জলছবি, জীবনের রঙ, একটি বাস্তব আবেদন, অব্যক্ত প্রশান্তি এবং কুলকিনারা শীর্ষক কবিতাগুলিতে।

যেমন,

স্কুলের ওয়ার্কিং রেসে যে শিক্ষক মহাশয়কে
দেখতাম প্রতি বছর পুরস্কার নিতে ;
দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর তাঁকে দেখলাম—
খুব সন্তর্পণে হেটে যেতে। (জীবনের জলছবি)

জীবনের রং ফুরিয়ে আসছে
আর কেউ রং দেয় না আমাকে
বোধ হয় দেবার মত ইচ্ছাটাই ফুরিয়ে আসছে।—(জীবনের রঙ)

তবে পংক্তি রচনায় ও বিন্যাসে কবিকে এখনো আরো যত্ন নিতে হবে,—প্রথম থেকেই এটি তাঁর অসতর্কতার নিদর্শন যা আশাকরি তিনি শীঘ্রই কাটিয়ে উঠবেন এবং প্রকৃত সাফল্যের মুখোমুখি হবেন।

অমলেন্দু ঘোষ

ছড়াছড়ি কলকাতা (২য় সংস্করণ) □ সাগর বিশ্বাস
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী □ ১৪ টাকা ।

শব্দের সঙ্গে শব্দের জোড় মেলানোর আদি প্রবণতা থেকে আদিমতম সমাজেই উদ্ভব হয়েছিল ছড়ার । ছেলে ভুলোনো গান, মায়ের কোলের দুলুনির সঙ্গে তালমিলিয়ে চলা ছন্দ, তাই ছড়ার আদি পুরুষ । তারপর তা কারুদক্ষ ছড়াকারদের হাতে পড়ে হয়ে ওঠে শিল্প ।

সাগর বিশ্বাসের বইয়ের ছড়াগুলি, শেষমলাটে অমিতাভ চৌধুরীর মন্তব্য অনুসারে 'ছড়ার যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তার প্রায় সবকটি'—তেই গুণান্বিত । সাগর ছড়াকে ব্যবহার করেন তার সমাজসচেতন মন, সূক্ষ্ম রসবোধ ও দেশপ্রেমের হাতিয়ার হিসেবে । এ যেন ছড়াদের সংহতি, সংহতির ছড়া । ৬৪টি ছড়ার মধ্যে কয়েকটি ছড়ায় এই মনকে চিমটি কেটে সচেতন করার কাজটা এত ভালোভাবে সংঘটিত হয়েছে যে তা আশ্চর্য না করে পারে না । যেমন :

কলকাতা সে ছোট্ট মেয়ে
কিছুই জানে না
কারা তাকে নষ্ট করে
কিছুই বোঝে না

নিউইয়র্কে রথের চাকা
কলকাতাতে রসি
গর্বাচিভের পেরেস্ত্রৈকা
টানছে তারে কষি ।

কিংবা

বাংরেজিটা কোন সে ভাষা ?
তাও জানো না, মুখ্খু !
বকচ্ছপের নাম শোনোনি
এটাই বড় দুখ্খু !

আবার এর পাশাপাশি এমন নির্দোষ মজা নেওয়া ছড়াও আছে যেগুলিতে শব্দের মজা ও অর্থের ননসেন্স অন্য মাত্রা পায়। সেগুলি হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস।

যদি কইলকাতা না জন্মাইতো
কইতে পারো কি হইতো ?
জোব চার্ণক নাও ঘুরাইয়া
ছিরামপুরে ভিড়াইতো।

অথবা

সঠিক পথে চলতে শেখো
কেউ যেও না wrong-রুটে
যাও যদি তো পাঠিয়ে দেবো
বার্মা কিম্বা বেইরুটে।

'কই যামু'র সঙ্গে 'নস্ত্রাদামু' অথবা 'আন্দ্রিকে'র সঙ্গে 'সান্ত্রী কে' মেলানো সাগরের ছড়ার কান কত পাকা সে কথারই প্রমাণ।

আমরা আশা করব সাগর আরো বেশি লিখবেন এবং সেই অসংখ্য ছড়ার মধ্যে কিছু কিছু আমাদের কানে লেগে থাকবে। কানের ভিতর, প্রাণের ভিতর বেঁচে থাকা, আর মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়া—ছড়ার এটিই বৈশিষ্ট্য। □

যশোধরা রায়চৌধুরী

পত্রিকা প্রাপ্তি সংবাদ

কলকাতা / প্রতিচ্ছবি, সৈনিকের ডায়েরি, আলাপ, পূর্ববার্তা, সাহিত্য রং বেরং

উত্তর ২৪ পরগণা / ডাক, দিগন্তবলয় (বিরাটি), ঝন্টা (হাবড়া), প্রেতি (নৈহাটি), বারাকপুর বার্তা (ব্যারাকপুর) পৌর ও গ্রামীন সংবাদ (বাদু)

দক্ষিণ ২৪ পরগণা / আভাতি (বিষ্ণুপুর), কিশোর কল্লোল (সোনারপুর), গঙ্গা-ভাগীরথী (আমতলা)

হুগলি / কাগজের নৌকা (বলাগড়) কবিতা নিয়ে (মাধলা) মত (শেওড়াফুলি)

মেদিনীপুর / ডুলুং (খড়গপুর)

কোচবিহার / কোচবিহার সংবাদ

ভিলাই (মধ্যপ্রদেশ) / মধ্যবলয়

ঢাকা (বাঙলাদেশ) / একবিংশ

বরিশাল (বাঙলাদেশ) / জীবনানন্দ

● চিঠিপত্র

দ্বিতীয় সংখ্যায় (এপ্রিল—জুন '৯৬) প্রকাশিত ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কবিতা ও কবিতা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত খুবই সুখপাঠ্য। প্রবন্ধ 'খণ্ড সময় থেকে অনন্ত সময়ের দিকে' (তারাপদ আচার্য) এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও হ্যামিলটন সাহেব' (সাগর বিশ্বাস)—রচনা দুটি খুবই অর্থবহ এবং তথ্য সমৃদ্ধ। 'কাচ' গল্পটির বিষয়বস্তু ও পরিবেশ রচনায় লেখকের কৃতিত্ব আছে। তবে আরো সুঠাম হতে পারতো গল্পটি। কবিতার সংকলনে অধিকাংশ কবিতাই সমসাময়িক কবিতার ধারাকে ধরে রেখেছে। আপনাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা এবং 'একুশ শতাব্দী' দীর্ঘজীবী হোক। **গজেন্দ্রকুমার ঘোষ**, সুইডেন।

আপনাদের নতুন পত্রিকা সত্যিই নতুন পথের দিশারী হবে। এই পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ রইল আমাদের 'ঐকতান' পত্রিকায়। আপনাদের উদ্যোগ সফল হোক এই কামনা করি। **শচীন দত্ত** শ্রীরামপুর, হুগলী।

সম্পাদকীয় থেকে তারাপদ আচার্যের নিবন্ধ অনিল চট্টোপাধ্যায়ের কথা, বই আলোচনা, কবিতাগুচ্ছ, মানস রায়চৌধুরী প্রসঙ্গ, সমবায় চিন্তা—সব মিলিয়ে 'একুশ শতাব্দী' (২য় সংখ্যা) একটি সুপরিকল্পিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন। যেমনটি হওয়া উচিত। তারাপদ আচার্যের নাম শুনেছিলাম। ব্যক্তিগত জীবনে কি অধ্যাপক ? ইংরাজী সাহিত্যও ওঁর ভালো জানা আছে মনে হলো। তবে জীবনানন্দের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বা কয়েকজন ইংরেজ কবির উল্লেখ ওর নিবন্ধে (খণ্ড সময় থেকে অনন্ত সময়ের দিকে) যেভাবে এসেছে আমার মনে হয়নি তাতে জীবনানন্দকে বোঝা বা আস্বাদনের ব্যাপারে পাঠক নতুন কোনও প্রেক্ষিত পাবেন। তবু এসব দরকারী হয়তো। মলাট থেকে পত্রিকার ছাপা—সব নিখুঁত। নামটি তো ঈর্ষনীয় সকলের কাছেই।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী বাঁকুড়া

আমি 'একুশ শতাব্দী' পড়ার সুযোগ পেয়েছি, ভীষণ ভাল লেগেছে। আপনার চিঠি পেলে খুশি হবো।

রুদ্র পতি রাখেড়া, পুরুলিয়া

দ্বিতীয় সংখ্যা (এপ্রিল—জুন '৯৬) 'একুশ শতাব্দী' আন্তরিকভাবে পড়লাম। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ মন কাড়ে। বিশেষ অলঙ্কার এ সংখ্যার লেখার বিষয়বস্তু। সুনির্বাচিত। প্রবন্ধ দুইটিই খুব মূল্যবান। কবিদের কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পড়েছি। একমাত্র গল্প 'কাচ' তেমন দাগ কাটতে পারেনি, অন্তত আমার কাছে। 'স্মরণের আবরণে' কবি মানস রায়চৌধুরী এক সময়ে ষাটের গোড়ার দিকে এখানকার পত্রিকা 'অঙ্কুর' এ লিখেছেন। আমরা একজন ভাল কবিকে খুব তাড়াতাড়ি হারালাম।

পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

তৃতীয় সংখ্যাও হাতে এলো। প্রথম বর্ষেই মাত করে দিলেন। আজকাল ভাল প্রবন্ধের অভাব অন্তঃ লিট্‌ল ম্যাগাজিনে। কিন্তু এ সংখ্যার প্রবন্ধ দুটোই ভাল ও মূল্যবান। গল্পে বিষ্ণু বিশ্বাস ও উমা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেরই হাত সুন্দর। কবিতাগুচ্ছে অনেক কবিই প্রতিষ্ঠিত, তাদের কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পড়েছি। সব মিলে সংখ্যাটি দারুণ হয়েছে।

এবারও বইমেলায় গিয়েছিলাম। চোখের সামনে বইমেলা পুড়ে ছাই হয়ে গেল—তার সাক্ষী রয়ে গেলাম। মনে দুঃখ ও কষ্ট নিয়ে ফিরেছি। এখানকার পত্রিকা 'মধ্যবলয়' এর একটা কপি পাঠালাম। বাঙলার বাইরে বাঙলা পত্রিকা প্রকাশ করার নানান অসুবিধা, তবুও অনেক বছর ধরে এটা প্রকাশ পাচ্ছে। যখন যুবক ছিলাম কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এখানে সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেছিলাম। এখন আমার বয়স বাষট্টি। জানিনা আর কতদিন টেনে নিয়ে যেতে পারবো।

পরবর্তী সংখ্যা 'একুশ শতাব্দী'র অপেক্ষায় রইলাম।

শিবব্রত দেওয়ানজী ভিলাই, মধ্যপ্রদেশ

একুশের এই পত্রিকাটি
আমার বড়ো প্রিয়,
সবার প্রিয় পত্রিকাটি
খুবই বরণীয়।
কত লেখা ভিড় যে এতে
সংখ্যাটি বইমেলা,
পাঠ করব মেলার মাঠে
প্রতি সাঁঝের বেলা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, বেনেপাড়া লেন কলিকাতা ১৪

এককথায় বলতে গেলে আজকের দিনে প্রবহমান জগতের এক মূলপ্রতিচ্ছবি আপনাদের পত্রিকা। আমিও সাহিত্য ভালোবাসি, লেখালেখি ভালোবাসি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং কয়েকটি লিটিল পত্রিকায় যুক্ত সাধারণ লেখক হিসেবে।

পত্রিকার সার্বিক উন্নতি ও প্রকাশের ধারা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি। এবং আপনাদের পত্রিকায় যদি এক সাধারণ সদস্য হিসেবেও মেনে নেন, আমি যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো।

অমিত দাস
৩০·সি শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
কলকাতা—৫৪

তোমার সাথে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়। আজকাল তুমি আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে উঠেছ। তুমি ছোট হলেও কি হয়েছে তোমার ভেতরে যা পাই তা অমূল্য। তোমার প্রত্যেকটি পাতার প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে এক নতুনত্বের গন্ধ পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যও আছে প্রচুর। তোমার এই ছিমছাম চেহারা আমায় আরো মুগ্ধ করেছে।

আশা করি তোমার গুণ আমার মতন অনেককেই আকৃষ্ট করেছে এবং করবেও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি দীর্ঘায়ু হও এবং তোমার চলার পথ যেন মসৃণ হয়।

দেবযানী দে
নবব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা

শ্রদ্ধেয় তারাপদ আচার্যর নির্দেশ অনুযায়ী একটা কবিতা পাঠালাম। নির্বাচিত হলে ছাপতে পারেন।

তারাপদদার মাধ্যমে (কার্তিক—পৌষ ১৪০৩) 'একুশ শতাব্দী' পড়ার সুযোগ পেলাম। কবিতার চেয়ে গদ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেটা বর্তমানে খুব দরকার। শতঘ্রু চাকীর চলচ্চিত্রের উপর প্রবন্ধ নতুনত্বের দাবী রাখে।

দেবাশিস চাকী
আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি

With best Compliments of

MONICA INDIA PVT. LTD.

South Jhaporda
Domjur.
Howrah

EKUSH SHATABDI

A Distinctive Bengali Periodical □ DL No. 04/96
Vol.2 ● No. 1-2 January—June 1997 ● Rs. 15

একুশ শতাব্দী-র

পরবর্তী বিশেষ সংখ্যা

তারাশঙ্কর

লিখবেন

তারাপদ আচার্য, উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চনচন্দ্রিকা মুখোপাধ্যায়, সরোজমোহন মিত্র, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, রুক্মা বসু, কমল মোমিন (ঢাকা) আরো অনেকে।

গ্রাহক, বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন দাতা বন্ধুগণ যোগাযোগ করুন

একুশ শতাব্দী
এন ২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৫১

ডালিয়া রায় (সর্বাধিকারী) কর্তৃক ইউ. এম প্রিন্টার্স, ১১১ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এন-২১ নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত।

একুশ শতাব্দী

শতবর্ষে তুলসী লাহিড়ী

লেখায় ☐ তথ্যে ☐ স্মৃতিচারণে

স্মরণের আবরণে

সুধী প্রধান

গল্প ☐ কবিতা ☐ বইপত্র

উত্তর ২৪-পরগণা মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা

মীনভবন, বারাসাত

স্বল্প সময়ে জলাভূমির উপযোগিতা ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিবিড় মৎস্য চাষের একমাত্র দিশারী "উঃ-২৪ পরগণা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা" মীন ভবন, বারাসত।

বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারীক তথা জেলার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারীক ও সহঃ মৎস্য অধিকর্তার সংগে যোগাযোগ করুন।

শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য
চেয়ারম্যান, এফ. এফ. ডি.এ.

এবং
সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগণা
জেলা পরিষদ, বারাসাত

শ্রীঅরুণ মিশ্র, আই. এ. এস
জেলা সমাহর্তা
উঃ ২৪ পরগণা, বারাসাত

শ্রীসমীরকুমার চৌধুরী
মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারীক
উঃ ২৪ পরগণা মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা
বারাসাত

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ২ ☐ সংখ্যা ৩-৪ ☐ ১৯৯৭

(জুলাই—ডিসেম্বর)

সম্পাদক ☐ সাগর বিশ্বাস

সহযোগী ☐ সুমিতা দত্তচৌধুরী

উপদেষ্টা ☐ অমিতাভ চৌধুরী দিলীপ চক্রবর্তী

যোগাযোগ ☐ এন ২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১

Best wishes from

Vyaparic Pratisthan Ltd

2. Brabourn Road [5th Floor]
Calcutta-700001
Phone 225-3992

Semicon Electronics Pvt Ltd

4. Adi Banstalla Lane
(6th Floor, Room No. 2)
Calcutta-700007
Phone : 239-7434 / 7456, 232-3678
Fax : (033) 239-0320

Mfg. of basic & cordless electronics telephones / EPABX / two lines / conference and other electronic systems.

একুশ শতাব্দী

শ্রাবণ—পৌষ ১৪০৪)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়—৮

প্রবন্ধ

নাট্যলোকের সংকট ☐ তুলসী লাহিড়ী ৯

তুলসী লাহিড়ী ☐ নিতাই সেন ১৫

শতবর্ষের প্রণাম ☐ দেবনারায়ণ গুপ্ত ২১

একটি নিঃশব্দ শতবর্ষ ☐ শুভ জোয়ারদার ২৩

নাটকে তুলসী দাস ☐ সাগর বিশ্বাস ৩৪

তুলসী লাহিড়ীর শিল্পকর্ম (সংকলন) ৩৮

গল্প

হেলিকপ্টার, চটের বস্তা এবং গুপি ☐ মৃদুল কান্তি দে ৩৯

কবিতা

ডি. জে. ইনরাইট / আবু হাসান শাহরিয়ার ৪৫

☐ ব্রাত্য রাইসু ৪৬ ☐ প্রমোদ বসু ৪৭ ☐ তীর্থঙ্কর মৈত্র ৪৭ ☐ নন্দদুলাল ভট্টাচার্য ৪৮ ☐ মধু গোস্বামী ৪৯ ☐ ব্রত চক্রবর্তী ৫০ ☐ তাপস রায় ৫০ ☐ কৃষ্ণা বসু ৫১ ☐ অনুরাধা মহাপাত্র ৫১ ☐ সুমিত্রা দস্তচৌধুরী ৫২ ☐ ☐ সমর্পণ মুখোপাধ্যায় ৫৩ ☐ সোমক দাস ৫৩ ☐ তিলোত্তমা বসু ৫৪ ☐ চন্দ্রানিকা বিশ্বাস ৫৫ ☐ কিংশুক রায় ৫৬ ☐ সন্ধ্যা ভৌমিক ৫৭

স্মরণের আবরণে

সুধী প্রধান ☐ কল্পতরু সেনগুপ্ত ৫৮

বইপত্র

স্বপ্নপরেশ সিলেবাসগুলি / স্বর্ণকুমার পালধি ৬১ ☐ জেগে ওঠে নদীর ঠিকানা / অমল রায় ৬২ ☐ মুহ্যমান জোনাকির নেশা / অন্য কেউ অন্য মানুষ / সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো / কুয়াশা কোবন / সুমিত্রা দস্তচৌধুরী ৬৩

প্রচ্ছদ

এষা বিশ্বাস

With best wishes from

Excel Drug House

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের

জনকল্যাণ প্রকল্প

- দাতব্য চিকিৎসালয় (অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি)
- অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- কুটির শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থান
- প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণ

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ

দক্ষিণ কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর

উত্তর ২৪ পরগণা

প্রতিষ্ঠাতা : ঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী

শিশু শিক্ষার বিশ্বস্ত বিদ্যালয়

নব শিশু নিকেতন

বিলরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

প্রধান শিক্ষক : বাদলচন্দ্র গুড়িয়া

সাহিত্য বিহার-এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ॥ বড়দিদি ৮·০০ ॥ পরিণীতা ৮·০০ ॥ চন্দ্রনাথ ৯·০০ ॥ পল্লী-সমাজ ১৩·০০ ॥ বিরাজ বৌ ১২·০০ ॥ অরক্ষণীয়া ৮·০০ ॥ বামুনের মেয়ে ১০·০০ ॥ গৃহদাহ ১৮·০০ ॥ গল্পসংকলন ১৮·০০ ॥ নিষ্কৃতি ৮·০০ ॥ স্বামী ৮·০০ ॥ পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ॥ নানাবিধান ৮·০০ ॥ বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ॥ দেনা-পাওনা ১৫·০০ ॥ রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ॥ কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ॥ মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ॥ দত্তা ১৫·০০ ॥ চরিত্রহীন ২০·০০ ॥ পথের দাবী ১৮·০০ ॥ কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ॥ প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮·০০ ॥ নাটক—ষোড়শী ১০·০০ ॥ বিজয়া ১০·০০ রমা ৯·০০ ॥

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ॥ পথের দাবী ২০·০০ ॥ চরিত্রহীন ২২·০০ দেনা-পাওনা ১৮·০০ ॥ শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ॥

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ॥ সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ॥

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন : ৩৫০-৯৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৯

Das Construction and Hardware

General order suppliers

All kinds of building materials and hardware goods

Bisharpara—24 Parganas [N]

Prop : Aloke Das

Contact :— Ph : 247-0020

Pioneer Airconditioning Co.

22/2, Karaya Road
Park Circus
Calcutta—700017

(For any airconditioning & refrigeration works)

Modern Sanitary & Hardware Stores

Govt. authorised non-levy cement dealer &
supplier of building materials
M. A. Sarani, Bankra, Calcutta-51

&

Modern Decorators
175/1, A.P.C. Roy Road, Birati, Calcutta—51
Phone : 512-2159, 512-2520

একুশ শতাব্দী

- তিনমাস অন্তর বেরোয় (জানুয়ারি—মার্চ, এপ্রিল—জুন, জুলাই—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—ডিসেম্বর)
- গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক তিরিশ টাকা। ডাকযোগে পঞ্চাশ টাকা। জানুয়ারী থেকে গ্রাহক করা হয়।
- লেখকেরা অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবেন। সঙ্গে পুরো ঠিকানা দেবেন।

With best compliments from

Eastern Monochem (P) Ltd

Manufacturer of various chlorinated Products

Office : L-10, Nabadarsha Society

Calcutta-700051

Phone : 512-4326

L, C. Concern

(Specialized in Survey & Soil Testing)

Topography, Engineering, Hydrography, Route,

Land, Quantity & Civil Works

7, C. R. Avenue, (Top Floor) Calcutta-700072

P.O. Box No. 556, Calcutta 700001

Ph. 26 2321 ● Fax : 033-2496871 ● Gram : Minhardale

With best wishes from

A Well Wisher

R. Krishnan

● সম্পাদকীয়

এ বছর বাঙলা রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য শিল্পী তুলসীদাস লাহিড়ীর জন্মশতবর্ষ পূর্তির বছর। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর মতো একজন প্রকৃত শিল্পীর যথার্থ মূল্যায়ণ আজও হয়ে ওঠেনি। এই শত বার্ষিকীতেও কি সরকারী কি বেসরকারী কোন স্তরেই তুলসী লাহিড়ীকে বিশদভাবে জানার বা জানানোর তেমন কোন আগ্রহ অথবা কর্মতৎপরতার খবর আমাদের জানা নেই। প্রয়াত সুধী প্রধানের সভানেতৃত্বে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একটি কমিটি সম্ভবত বছরের গোড়ার দিকেই গঠিত হয়েছিল যার মধ্যে দেবনারায়ণ গুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা বিভাস চক্রবর্তীর মতো নাট্য-ব্যক্তিত্বের নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য যে কমিটির কোন কর্মসূচীর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে নেই।

আমরা যারা চল্লিশের দশকে অবিভক্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি তাদের পক্ষে এই মহান শিল্পীর কাজ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ছিলনা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চাঞ্চল্য ও সে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দোচ্ছ্বাস সমকালীন অনেক ইতিহাসকেই তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তুলসী লাহিড়ী এই ভেসে যাওয়া ইতিহাসেরই দুর্লভ সামগ্রী। 'একুশ শতাব্দী' তার সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে বঙ্গ সংস্কৃতির সেই বিস্মৃত শিল্পীকে আজ পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে।

সমসাময়িক নাট্যব্যক্তিত্ব যাঁরা তাঁর গাঢ় সান্নিধ্যে ছিলেন, কেউই প্রায় বেঁচে নেই। অল্প দু'চারজন যাঁরা আছেন তাঁদেরও স্মৃতির পাতা ধূসর হয়ে এসেছে। গুরুতর অসুস্থ দেবনারায়ণবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়েও যে আন্তরিকতায় স্মৃতিচারণ করেছেন তা আমাদের এক দুর্লভ প্রাপ্তি। উপরোক্ত শতবর্ষ কমিটির সম্পাদক শুভ জোয়ারদার বিস্মৃতপ্রায় শিল্পীর উপর অনেকটাই আলোকপাত করেছেন। অতীতের দুটি লেখা আমরা পুনর্মুদ্রণ করেছি। একটি স্বয়ং তুলসী লাহিড়ীর, অন্যটি তাঁর মৃত্যুর পরে নিতাই সেনের লেখা যা 'অভ্রান্ত' বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। এ সবের মধ্য দিয়ে এই প্রজন্মের পাঠক অখণ্ডিত ও পরে বিখণ্ডিত বাঙলার সেই আপোশহীন অভিমানী শিল্পীর একটা সাধারণ রূপরেখা পেয়ে যাবেন আশা করা যায়। সম্প্রতি প্রয়াত সুধী প্রধানের দীর্ঘ ও শেষ সাক্ষাৎকার সহ সংগৃহীত আরও কিছু তথ্য স্থানাভাবে সন্নিবেশ করা গেলনা। এজন্য দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া কীই বা করতে পারি আমরা? ছোট পত্রিকার বড় সাধ আর গরীবের ঘোড়া রোগ সম্ভবত সমার্থবোধক। []

● প্রবন্ধ

[১৯৬৩ সালে (জুলাই ?) রঙমহলে 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটকের শততম অভিনয় উপলক্ষে 'রূপকার' প্রকাশিত স্যুভেনিরে লেখাটি ছাপা হয়। পরবর্তী কালে এ লেখা অন্য কোথাও সংকলিত হয়েছে বলে জানা নেই। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতেও লেখাটির প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় আমরা লেখাটি হুবহু পুনঃপ্রকাশ করলাম।—সম্পাদক]

নাট্যলোকের সঙ্কট

তুলসী লাহিড়ী

স্বদেশের ব্যক্তি বিশেষের যশে বা কোনও প্রতিষ্ঠানের খ্যাতিতে, সে দেশবাসী সাধারণ জনগণ স্বভাবতই গৌরব অনুভব করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাংলাদেশে যখন শিক্ষায় বিজ্ঞানে কাব্যে সাহিত্যে রাজনীতিতে বহু দিকপালের আবির্ভাবে সমগ্র ভারতের বিস্ময়ের কারণ হ'য়েছিল, তখন তাদের গৌরবে বাংলার জনসাধারণ গৌরব বোধ ক'ত্ত এবং সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা পেত।

আজ এদেশে অবসাদের যুগ চলেছে একথা প্রায় সর্ব্বজন স্বীকৃত। নানা কারণে এ অবসাদ এসেছে। তাই সেই কারণগুলি দূর করে যাতে আবার পূর্ব্ব গৌরবের স্থান এদেশ অর্জ্জন কত্তে পারে তার জন্য নানা স্থানে নানাভাবে আলোচনা চলেছে। নাট্যকলা ও সাধারণের জন্য রঙ্গালয় নিয়েও বাংলা গৌরব ক'ত্তো। আজ সেসব সঙ্কটের কথাও প্রায় সর্ব্বজন স্বীকৃত!

এই সঙ্কট সম্বন্ধে নানা স্থানে নানা রকম উক্তি শুনতে পাওয়া যায়। প্রকৃত রসিকগণ, যারা রসের প্রধান অবলম্বন, তাঁরা এখন কদাচিত নাটক দেখতে যান। এ বিমুখতার কারণ সম্বন্ধে তাঁরা বলেন—কি বিষয়বস্তু কি আঙ্গিকে প্রতিভার কোনও নিদর্শন আজ নাই আছে শুধু বাহ্যিক চাকচিক্যে অপরিণত মন ভোলাবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা। প্রতিভাশালী নট আজও যা দুচারজন আছেন তাঁদের প্রতিভা পরিস্ফুট হবার মত চরিত্র ও সংঘাত সৃষ্টিতে সার্থক নাটক আর হচ্ছে না। অতীতের যে নাটকগুলি Classic-এর মর্য্যাদা পেয়ে ধন্য হ'য়েছিল আজকাল তারও মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখে অভিনয় করান সম্ভব হ'চ্ছে না। নিতান্ত

দৈন্যের মধ্যে কায়ক্লেশে জোড়াতালী দিয়ে তাদের উপস্থিত করা হ'চ্ছে। তাই শক্তিমান নট যাঁরা তাঁরাও নিরুৎসাহ হ'য়ে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁরা বলেন, যে বহু খ্যাতনামা নট সমাবেশ সত্বেও সে সব পুরাতন সার্থক নাটকও আর দর্শককে বেশীদিন আকর্ষণ করে না। অথচ দেখা যাচ্ছে একটি নাটক, যাতে শক্তিমান নটনটীর সংখ্যা খুব বেশী নয় এমন কি যে নাটককে নাটকের সংজ্ঞা অনুসারে নাটকই বলা যায় কিনা সন্দেহ, তাও দিনের পর দিন দর্শক আকর্ষণ ক'রে যাচ্ছে। মুগ্ধ হ'য়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রলেও, নিন্দা বা অবহেলা কেউ ক'চ্ছে না। এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করায়, জনৈক রসিক বলেছেন—"ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রশ্ন যেখানে, ভাল না পেলে মন্দ দিয়েই উদর পূরণ ক'ত্তে হয়। আনন্দের ক্ষুধা সম্বন্ধেও ঠিক এই রীতি চলে। মেলাতলার বহু ভেজাল ও বিস্বাদ খাবারের দোকানের মধ্যে একটাতেও কম ভেজাল এবং বিস্বাদ নেই জানলে লোকে ভীড় করবেই। ভুলে যেও না আজকের কলকাতা প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের বাসস্থান।" কথাটায় শ্লেষ বেশী থাকলেও সত্য খানিকটা আছে।

আমাদের দেশে নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কল্লে দেখা যায়—যখন সাধারণের জন্য রঙ্গালয়ে নাটক অভিনয় শুরু সেই নাটকের অর্জ্জিত অর্থে সকল ব্যয় সঙ্কুলান ক'ত্তে হ'ল, তখন অসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বশালী নটগুরু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকেও অনেক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যুদ্ধ ক'ত্তে হ'য়েছে। দর্শকের রুচির উন্নতি—অভিনয় কলার উন্নতি—প্রয়োগ কৌশলের উন্নতি—তাঁর আশানুরূপ তিনি ক'রে যেতে পারেননি। বহুবার অগ্রসর হ'তে গিয়ে নিরাশ হ'য়ে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। দর্শকের চাহিদা না মিটলে—রঙ্গালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। সে যুগে কিছু ধনী মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য ক'রেছেন। তাতে সাময়িকভাবে বেঁচে থাকার সমস্যা মিটলেও প্রকৃত সুফল হয়নি। অনেক সময় সেই সাহায্যকারীদের খেয়ালখুশী ও মর্জ্জির চাপে হিতের পরিবর্ত্তে অহিতই হ'য়েছে। আবার সেই সব ধনী সাহায্যকারীদের অভাব হলেই—দর্শকের চাহিদার অনুসরণ ক'ত্তে গিয়ে ক্রমে রসের পরিবর্ত্তে রসবিকৃতি এসে পড়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর পর—শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবে ষ্টারে আর্ট থিয়েটার বিশিষ্ট কলা রসিকগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হওয়ায় রঙ্গলোকে নূতন ক'রে একটা জোয়ার এল। অভিনয় গুণে ও প্রয়োগ কৌশলে

অনেক কয়টি ভাল নাটক রসোত্তীর্ণ হয়ে দর্শকদের তৃপ্তি দিল। নাট্যলোকে একটা আভিজাত্যের আবহাওয়া দেখা দিল। কিন্তু সে জোয়ারকে ধ'রে রাখতে পারে এমন ভাল নাট্যকার এল না। কিছু চলনসই নাটক ও কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে অভিনেতার দল নিজেদের ক্ষমতায় কিছুদিন যশ অর্থ অর্জন ক'রে সব দিক বজায় রেখে অবশেষে আবার সেই অবসাদের মুখে এসে পড়লেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সব কিছুই প্রাণশক্তিহীন হ'য়ে পড়ল। আজও রঙ্গলোক সে অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বারবার ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ ক'রে অনেকে অনেক কথা ব'লেছেন। আমার মনে হয় নানা কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ হ'চ্ছে, অশিক্ষিত পটুত্বের উপর নির্ভর করা। এদেশে নাট্যকলার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। যে যার নিজের তাগিদে দেখে শুনে কিছুটা শিখে নেয়। কখনও কখনও এই দিয়েই সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই অশিক্ষিত পটুত্বের প্রধান বিপদ এই যে "এ চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি না চল্লেই হতবুদ্ধি"। একটা বিষয়ে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিক ভাল ক'রে শিক্ষা ক'রে কাজে নামলে বিপদ কদাচিৎ আসে। আর এলেও তাকে কাটিয়ে ওঠার শক্তি সেই অর্জিত জ্ঞান থেকেই সম্ভব হয়।

প্রথমত মালিকরা এ ব্যাপারে অশিক্ষিত। ফলে তাঁদের নির্দেশে সব সময় আশানুরূপ ফল হয় না। তাছাড়া নূতন প্রতিভা তাঁর জ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে কিছু তাঁর কাছে উপস্থিত ক'রে আমল পায় না। নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিকে বাদ দিলে রসের আসরে সব চেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে নূতনত্বের সম্ভাবনা আপনা থেকেই কমে যায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমদানীটাই কোনও প্রচেষ্টার সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরে নিয়ে ক্রমাগত ভুল করতে থাকেন। এ ভুল হয় তাঁদের নাটক নির্বাচনে অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচনে এবং অন্যান্য সব কিছুতেই। সার্থক হ'লে কি কি কারণে সার্থক হ'ল তাও সঠিকভাবে বোঝেন না আবার ব্যর্থ হ'লেও ত্রুটিগুলি অনুসন্ধান ক'রে দেখে সে সম্বন্ধে সচেতন হ'তে চান না। সব চেয়ে মারাত্মক কথা হচ্ছে এই তাঁদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার জন্য দালালের হাতে পড়েন এবং সর্ব বিষয়ে মূল্য নিরূপণে ক্রমাগত ভুল ক'রে নিজেদের ক্ষতির কারণ তাঁরা নিজেরাই হ'ন।

নাট্যকার নট প্রভৃতি সব কিছুর বেলায় এই অশিক্ষিত পটুত্বই এখন পর্যন্ত কাজ চালাচ্ছে। তাই নাট্যলোকের অগ্রগতি একটা সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত

ধারা ধরে চলেছে না। প্রতিভা ও শিক্ষা নিয়েও যে দু একজন এ জগতে এসে পড়েছেন তাঁরাও এই পরিবেশে ব্যর্থ হ'য়েছেন।

অনেক কিছুর সমন্বয়ে একটি নাটক সুঅভিনীত হয়। প্রতি বিভাগেই শিক্ষার উপরেও আর একটা কথা আছে। পরীক্ষা ও নিরীক্ষা। এই পথে যারা প্রস্তুত হন তারাই নিজ নিজ বিভাগের উন্নতি করে সমগ্রভাবে সার্থক নাটকের সৃষ্টি করতে পারেন।

সার্থক নাট্যকারের আবির্ভাব সম্ভব করতে হ'লে চাই সুশিক্ষিত নাট্যকার—যে ক্রমাগত বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা ক'রে সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হবে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না—কতটা মালিকদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার জন্য—কতকটা অশিক্ষিত পটুত্ব সম্বল স্বার্থপর নটনটীর জন্য Colleborater বা সহকারীদের সশ্রদ্ধ সাহায্য পাওয়া আজকের রঙ্গজগতে সুকঠিন। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার Somerset Maugham তাঁর Summing up পুস্তকটিতে তিনি কেন নাটক লেখা ছেড়ে দিলেন বলতে গিয়ে যা বলেছেন সে কথা এদেশেও খাটে। ফলে চরিত্র ও ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি ক'রে মনোরম উপন্যাস লিখে যে সব সাহিত্যিক যশস্বী হয়েছেন তাঁরাও নাটক লিখতে চান না। অথচ তাঁদের লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপ অনেক সময় সাফল্য আনে। উপন্যাসে ও নাটকে যে প্রভেদ আছে সে কথাও নাট্যলোকের অনেকে বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন না।

অভিনেতাদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে তাদের কলাকৌশলের মান ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তারও কারণ শিক্ষার অভাব। কিছুদিন আগেও রঙ্গমঞ্চে মহলার সময় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া যারা বহুদিন ধরে রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতেন তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেও অভিনয়ের কতগুলি মূল সূত্র আয়ত্ব ক'রে ফেলতেন। আজকাল সিনেমার Massproduction-এর অভিনয় কলাকে বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হয় না বলেই এ যুগে কিছু না জেনেও অভিনেতা হওয়া যায় এই বিশ্বাস অনেকের হয়েছে। অভিনয় কলা শিক্ষার মূল সূত্র সহজেই জেনে নেওয়া যায় কিন্তু তাকে আয়ত্ব ক'রতে বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে সচেতন হ'তে হয়। কোনও একজন অরসিক বলেছিল "হারমোনিয়াম বাজান কিছু নয়। বাঁহাতে বেলো টানা আর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো পর্দ্দার উপর চালান। কোনটার পর কোনটা সেইটে দেখে নিলেই হ'ল।" কিন্তু সেটা দেখে নিয়ে সুরে ছন্দে মনোরম ক'রে তুলতে অনেক বৎসর

চেষ্টা ক'রে হয় এটা সকলেই জানে। অভিনয় কলা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটাই খাটে আজকের দিনের ফিল্ম-বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীর দল তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। তারা তাত্ত্বিরী যশ পাবার সহজ পন্থা খুঁজে পেতে ব্যস্ত।

সুগায়ক বা গায়িকা রঙ্গমঞ্চে নাই। আজ যে পদ্ধতিতে মাইক্রোফোন সাহায্যে গান গাওয়া হয় তাতে ভবিষ্যতে মঞ্চে সুগায়ক বা গায়িকার আবির্ভাব আশা করা কঠিন। কণ্ঠস্বর সম্পদ ছাড়াও মঞ্চে গাওয়ার জন্য আরও অনেক কিছু শিক্ষনীয় ও আয়ত্ব করার আছে। মাথা নেই যখন তখন মাথা ব্যথার কথা ভাবা বাহুল্য মাত্র। একটি ভাল নাটক ভাল অভিনয় হয়েও বিফল হতে পারে যদি সমগ্রভাবে তাতে মাত্রা জ্ঞানের অভাব থাকে। অবান্তর রস প্রাধান্য পেলে মূল রস চাপা পড়ে যায়। নাট্য পরিচালক নাটককে সমগ্রভাবে রসোত্তীর্ণ করার জন্য দায়ী। তাঁর মাত্রাজ্ঞান ও রসবোধের ত্রুটি বা অবহেলা অনেক সময় মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্রনাথ নাটকের নাম করা যেতে পারে। অনেক কয়েকটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী সুঅভিনয় করেও আশানুরূপ সাফল্য আনতে পারেনি। অবান্তর রসের মাত্রাধিক্য এই বিফলতার কারণ। পরিচালক দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, যে মঞ্চে নামলে অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে লাগাম টানার কোনও উপায় তাদের হাতে নেই। তাছাড়া মালিকরা সস্তার হাততালী শুনে মূল্য নিরূপন করেন। কাজেই সব বুঝেও পরিচালকের চুপ করেই থাকতে হয় এবং নটনটীরাও মাত্রা হারিয়ে বিকটতাদোষ দুষ্ট অভিনয় করেন। এই সব প্রমাদের কারণও অশিক্ষিত পটুত্ব। রঙ্গমঞ্চের কর্ম্মীদের শৃংখলা নিয়মানুবর্ত্তিতা ও মাত্রাজ্ঞান এর যে কোনটার অভাবে যে ক্ষতির কারণ এ শিক্ষা আজও ভাল করে হয়নি।

লাভের আশা না থাকলে ব্যবসা হয় না। আবার ঐ লোভের আধিক্য বর্ত্তমান যুগে সমাজনৈতিক রাজনৈতিক কতই না বিশৃংখলা এনেছে। নাট্য-লোকেও তাই। রসের ব্যবসায়ে রসিককে বাদ দিয়ে উন্নতি হয় না বরং রসিকদের উৎসাহে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উৎসাহ আনে এবং ক্রমে তাদেরও রসিক করে তোলে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রের সমালোচনার দায়ীত্ব অনেকখানি। ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসায়ে মুনাফা জোগায় বলেই তারা যদি তাদেরই খুসী করতে সুরু করেন তার ফলে রস বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। তাঁদের মতামতের উপর সাধারণ লোক সব সময়েই বিশ্বাস রাখে এবং শ্রদ্ধা করে।

নাট্যলোকের ক্রমাবনতি দেখে, বিচ্ছিন্নভাবে রসিকদের তাগিতে কতগুলি অবৈতনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তারা দৈন্যের মধ্যেও কিছু রসোত্তীর্ণ নাটক

পরিবেশন ক'রেছেন। ব্যবসায়ের বাজারে তার মূল্য কি তা নিরূপণ করার সুযোগে তারা বঞ্চিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুনাফা লোভীদের স্বেচ্ছাচারীতা, যা জাতিকে দুঃখিত ক'রেছে, এরা তার প্রতিবাদ ক'রেছে। দিকপাল নটনটী বা নাট্যকার এখনও আসেনি কিন্তু তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার উৎসাহে সে সম্ভাবনা আশা হ'চ্ছে।

তাদেরও দুঃখ অনেক। অর্থাভাব—নিয়মিত অভিনয় করার সুযোগের অভাব এবং প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীদের নানাভাবে তাদের সঙ্ঘ শক্তিকে বিশৃঙ্খল করার কৌশল এ সব ত আছেই তাছাড়াও আছে তাদের নিজেদেরও অনেক প্রকার দোষ ত্রুটি। যে সব আনন্দের আশায় এই সব অভিনয়ের সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তার প্রধান কারণটি হ'চ্ছে সাজবার আনন্দ। কোন নাটকেই সবাইকে সমভাবে সে আনন্দ দেওয়া সম্ভব হয় না। যে চরিত্রের পরিণতি নাটকের মূল বক্তব্য সে সহজেই প্রাধান্য পায়। তার কথাই দর্শক বেশী ক'রে বলে এবং এই যশ লাভ করার সুযোগ পাওয়া নিয়ে অনেক সময় দলে ভাঙ্গন ধরে।

তবুও এই সব অবৈতনিক সখের দল থেকেই অতীতে সাধারণ রঙ্গালয়ে নটনটীর জোগান দেওয়া হ'ত। আজ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে আজকাল অভিনয় করার সুযোগ তাদের কম ঘটে। উপর্য্যুপরি অভিনয়ে ক্রমে দোষমুক্ত হয়ে তাদের শক্তি পূর্ণ বিকাশ হবার সুযোগ পায় না। তাছাড়া দুএকবার অভিনয় করেই সিনেমার রাজ্যে অর্থলোভে তারা উমেদারী করতে মেতে যায়। ফলে তাদের এদিক ওদিক দুদিক যায়। অভিনেতাদের চেয়ে অভিনেত্রী হবার সম্ভাবনা হারাবার এটা প্রধান কারণ।

এই সব দোষ ত্রুটি কাটিয়ে নাট্যকার ও নটনটী সৃষ্টি করার একমাত্র উপায় পরীক্ষামূলক প্রেক্ষাগৃহ। উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেবার এবং উৎসাহ দেবার এরকম একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বসাধারণের সৌন্দর্য্য সুরুচি বোধের উন্নতি করার এমন একটি শক্তি বিপথে গিয়ে দেশের অহিত ক'চ্ছে এ বোধ রাষ্ট্রনায়কদের হ'য়েছে। কিছু আয়োজন ও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। তবে তা দেখে রসিক মনে কোনও আশার সঞ্চার এখনও হয়নি। এ যেন "রাজা ধন বিলাচ্ছেন—কোথায় না অন্তপুরে—নিচ্ছে কে না রাণী" এই ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

এ সব আমার ব্যক্তিগত মতামত। হয়ত নির্ভুলও নয়। তবু নাট্যরসিক এ সম্বন্ধে একটু অবহিত হলে সুফল ফলতে পারে মনে হয় বলেই এই প্রবন্ধ লেখা হ'ল। □

[১৯৫৯ সালে তুলসী লাহিড়ীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তৎকালীন রূপমঞ্চ পত্রিকার জুন-জুলাই সংখ্যায় বর্তমান লেখাটি বেরিয়েছিল। আমরা লেখাটির বৃহদংশ এখানে হুবহু তুলে ধরলাম। ইতিহাসগত কারণে বানান কিংবা বাক্য গঠন অপরিবর্তিত রাখা হলো।—সম্পাদক]

পরলোকে প্রখ্যাত নট, নাট্যকার, পরিচালক ও সুরকার

তুলসীদাস লাহিড়ী

নিতাই সেন

সোমবার ২২শে জুন, ১৯৫৯, বাংলা ৭ই আষাঢ়, ১৩৬৬, সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় বাংলার প্রখ্যাত নট, নাট্যকার ও সংগীতজ্ঞ তুলসী লাহিড়ী পরলোক গমন করেছেন। দীর্ঘ ৯ মাস কঠিন উদোরী রোগে (সিরোসিজ অফ লিভার) তিনি ভুগছিলেন। বিগত ৮ই জুন স্বর্গত লাহিড়ীকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতালে ভরতি করা হয় এবং ৯ই জুন ডক্টর সতী ঘোষ, শ্রীযুক্তা উমা দাস, নাট্যকার মন্মথ রায়, সুধী প্রধান প্রভৃতির চেষ্টায় শুকলাল করনানী হাসপাতালের (পি. জি) ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়। এবং প্রযোজক পরিবেশক অসিত চৌধুরী ও রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাবিত এস. ও এস ফান্ড থেকে ৬৩০৲ টাকা চিকিৎসার জন্য দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত ভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গও স্বর্গত লাহিড়ীর অনুরাগীর দল তার সুচিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করেন। এখানে পৃথক একটি কেবিনে রাখা হয় —সেবার জন্য পৃথক ভাবে সেবিকা রাখা হয়! সর্বাধুনিক চিকিৎসার কোন ত্রুটিই রাখা হয় না। কলকাতায় একটী দুষ্প্রাপ্য ওষুধ না পাওয়া যাওয়াতে—বম্বেতে অভিনেতা বিপিন গুপ্তকে জানানো হয় এবং তিনি সংগে সংগে সে ওষুধ রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন। সুচিকিৎসায় এবং সযত্ন তদারকে তুলসীবাবু ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে থাকেন। নাট্যকার মন্মথ রায়, সুধী প্রধান, কালীশ মুখোপাধ্যায়, কালী সরকার, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, ডক্টর সতী ঘোষ, শ্রীযুক্তা উমা দাস, কমলা ঝরিয়া

প্রভৃতি এবং তুলসীবাবুর মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র—দীনেন ও গোবিন্দ লাহিড়ী, স্ত্রী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন নিয়মিত দেখা শুনা করেন। তাছাড়া ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু প্রকাশ ঘোষ, অসিত চৌধুরীর পক্ষ থেকে নীরেন শীল, সত্যজিৎ রায়ের প্রডাকসন ম্যানেজার অনিল চৌধুরী, মহারাজকুমার সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, বহুরূপী সম্প্রদায়ের সভ্যবৃন্দ প্রভৃতি আরো অনেকে হাসপাতালে তুলসীবাবুকে পরিদর্শন করেন। পরিচিত বন্ধুদের পেয়ে অনেক সময় গল্পগুজবে তিনি মেতে উঠতেন। পি. জি. হাসপাতালের ব্যয় ভার বহন করাও যেমন শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে আসছিল—তেমনি আরোগ্যের পথে মনে করে বিগত ৭ই জুন তুলসীবাবুকে তার ১৫৮বি রাসবিহারী এভেনিউস্থিত বাসা বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এখানে ডাঃ হিমাংশু রায় এম. ডি ও ডাঃ রবি ঘোষ এম. বি বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর চিকিৎসায় রত থাকেন এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকেই শ্রীমতী গৌরী পালকে সেবিকা রূপে নিয়োগ করা হয়। শ্রীমতী পাল আন্তরিকতার সংগে তুলসীবাবুর পরিচর্যা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন চেষ্টাই ফলবতী হলো না। ২২শে জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী, মধ্যম পুত্র শ্রীদীনেন লাহিড়ী, জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীনিবাস গোস্বামী, জ্যেষ্ঠা কন্যা শংকরী গোস্বামী ও আরো বহু আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত ছিলেন। রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে সর্বপ্রথম স্বর্গত লাহিড়ীর মৃত্যুসংবাদ জানান শ্রীসুধী প্রধান। কার্যালয় তখন বন্ধ। অফিসে একা সম্পাদক। তিনি টেলিফোন যোগে কলকাতার থিয়েটার, স্টুডিও ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের এই শোক সংবাদ জানিয়ে—নাট্যকার মন্মথ রায়ের নির্দেশে দৈনিক পত্র পত্রিকাগুলির জন্য স্বর্গতঃ লাহিড়ীর মৃত্যু সংবাদ সহ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সরবরাহে রাত ১টা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। মৃত্যু সংবাদ পাবার সংগে সংগে যারা রাসবিহারী এভেনিউর বাড়ীতে স্বর্গতঃ লাহিড়ীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন এবং শেষ দায়িত্ব সম্পাদনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন—তাদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়, ডক্টর সতী ঘোষ, বহুরূপীর শম্ভু মিত্র, অমর গাঙ্গুলী ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দ, রূপকার-এর সভ্যবৃন্দ, আই পি. টি, লিটল থিয়েটার, অগ্রগামী শিল্পী সংঘের সভ্যবৃন্দ, বিশ্বরূপার পক্ষে গোপী দে, অভিনেতা নির্মলকুমার, তপন সিংহের পক্ষে পীযূষ বসু, সুরস্রষ্টা পঙ্কজ কুমার মল্লিক, সুধী প্রধান, পরিচালক কমল মজুমদার, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল চৌধুরী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, জ্ঞান মজুমদার, কানাইলাল

বসু, চারু প্রকাশ ঘোষ, সুনীল দত্ত, রনেন মিত্র, বলাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। যে সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে শবদেহে মাল্যার্পণ করা হয়—তাদের মধ্যে বহুরূপী, রূপকার, লিটল থিয়েটার, অগ্রগামী শিল্পী সংঘ, আই পি টি এ বিশ্বরূপা থিয়েটার, তপন সিংহের ক্ষণিকের অতিথি চিত্রের কর্মী সংঘ, ডক্টর সতী ঘোষ প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। রাত ১১-৩০টায় শোভাযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে শবদেহ নেওয়া হয় এবং বৈদ্যুতিক চুল্লীতে দাহ করা হয়। মুখাগ্নি করেন স্বর্গত লাহিড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গোবিন্দ লাহিড়ী। রাত ৪টায় দাহ কার্য সংপন্ন হয়।

বাংলা ২৩শে চৈত্র, ১৩০৩ ইংরেজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অধুনা পাকিস্থান স্থিত রংপুর জেলার গাইবান্ধাস্থিত নলডাঙ্গার বিখ্যাত বারেন্দ্র জমিদার বংশে বাংলার প্রখ্যাত নট, নাট্যকার ও সংগীতজ্ঞ তুলসী লাহিড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গতঃ সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে দেশের মাটিতেই দেহ রাখেন। তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে এক ভগ্নী তুলসীবাবুর জীবিতাবস্থাতেই মারা যান। ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন তুলসীদাস লাহিড়ী। মধ্যম স্বর্গত গোপাল লাহিড়ী ছিলেন একজন প্রখ্যাত বংশীবাদক। তুলসীবাবুর পূর্বে তিনিও মারা যান। কনিষ্ঠ—ধীরেন লাহিড়ী জীবিত। মাতা শৈলবালা দেবীও তুলসীবাবুর জীবিতাবস্থাতেই মারা যান ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। স্বর্গতঃ লাহিড়ীর পূর্বপুরুষেরা কোচবিহার রাজস্টেটে কাজ করতে এসে রংপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং জমিদারীর গোড়া পত্তন করেন। বাল্য শিক্ষা শুরু হয় রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কলকাতার সারদাচরণ ইনসটিটিউশন থেকে। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে—বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন রংপুর কলেজ থেকে। কলকাতায় এক সঙ্গে এম.এ ল পড়তে থাকেন। দু'বছর এম. এ পড়েও পরীক্ষা দিতে পারেন না। অবশ্য রিপণ কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতা সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ছিলেন একজন গুণী সংগীতশিল্পী। তাই বাড়ীতে তদানীন্তন বড় বড় সংগীতজ্ঞরা আসতেন। অবশ্য পিতার কাছেই তুলসীবাবুর প্রথম সংগীত শিক্ষা। এরপর ওস্তাদ খেলাফত হোসেনের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। অভিনয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন রংপুরের প্রখ্যাত সৌখীন নাট্য শিক্ষক স্বর্গতঃ তারাপ্রসন্ন সান্যালের কাছে। আইন পাশ করে রংপুরে কিছুদিন আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবং এখানেই

সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন—পরপারে নাটকে ভবানীপ্রসাদের চরিত্রে। তারাপ্রসন্নবাবু ছিলেন পেশকার। কিন্তু অভিনয় নিয়েই মেতে থাকতেন তিনি। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। রংপুরে তারাপ্রসন্ন বাবুর তত্ত্বাবধানে তুলসীবাবুর পরিচালনায় সর্ব প্রথম অভিনীত হয় মিশরকুমারী নাটক। এরপর শরৎচন্দ্রের দত্তার নাট্যরূপ দেন তিনি এবং সে নাট্যরূপ রংপুরে অভিনীত হয়। তখনও অবশ্য কলকাতায় বিজয়া নাটক অভিনীত হয়নি। দত্তায় অভিনয়ও করেন। এই নাট্যরূপে প্রবোধ মুখোপাধ্যায়ও তুলসীবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তুলসীবাবুর পরবর্তী নাটক 'চিরকুমারসভা'। অর্থাৎ রংপুরের সৌখীন নাট্যাভিনয়ে—পরপর ১) পরপারে ২ মিশরকুমারী ৩) দত্তা ৪) চিরকুমার সভা এই চারখানি নাটকে তুলসীবাবুর আত্মপ্রকাশ। এই সময় রংপুরে আরও যেসব নাট্যপ্রতিভা খ্যাত হয়ে ওঠেন তাদের মধ্যে স্বর্গতঃ উৎপল সেন, স্বর্গতঃ রবি রায়, স্বর্গতঃ ভূমেন রায়, স্বর্গতঃ ডাঃ জিতেন সোম, স্বর্গতঃ গোপাল লাহিড়ী, স্বর্গতঃ সাহিত্যিক প্রবোধ মজুমদার ও কাজী মহম্মদ ইলিয়াসের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রংপুরের পাবলিক লাইব্রেরী, ড্রামেটিক ক্লাব, প্রভৃতির সংগেও তুলসীবাবু ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তুলসীবাবু বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন। পাবনার স্বর্গতঃ মুরলী মোহন গোস্বামীর কন্যা শ্রীযুক্তা শান্তি দেবীকে তুলসীবাবু বিবাহ করেন। ৪টি পুত্র ও দুটী কন্যার মধ্যে ১) জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্র লাহিড়ী পাকিস্থানেই আছেন। ২) দীনেন্দ্র, ৩) রমেন্দ্র ৪) গোবিন্দ—এরা তিনজন মা ও ছোট বোন তপতীকে নিয়ে দমদমার ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শংকরী গোস্বামীর স্বামী শ্রীনিবাস গোস্বামী। মৃত্যুকালে বিধবা স্ত্রী, ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও জামাতাকে রেখে গেছেন তুলসীবাবু।

আইন ব্যবসায় বেশীদিন মন টেকে না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এসে অবশ্য কয়েক দিন আলিপুর কোর্টে যাতায়াত শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে কিছুদিন মেসে মেসে কাটান এবং প্রখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী ও তুলসীবাবু এক মেসে প্রায় ৪ বৎসর অতিবাহিত করেন। স্বর্গতঃ কৌতুক স্রষ্টা বিমল দাশগুপ্তের সংগে তুলসী-বাবুর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল এবং তার বাড়ীতেই ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হন। তুলসীবাবু তখন গীত রচনায় হাত পাকাতে শুরু করেছেন। তুলসীবাবু রচিত কয়েকখানা গান শুনে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ

সাহেব খুব মুগ্ধ হন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এইচ এম, ভিতে তুলসীবাবু রচিত দুখানি গান রেকর্ড করেন। এরপর মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় তুলসীবাবু রচিত কয়েকখানা গান এইচ এম ভি তে রেকর্ড করাবেন বলে নিয়ে যান কিন্তু তা সফলকাম হয় না। শেষ পর্যন্ত তুলসীবাবুর এক আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে মেগাফোন কম্পানীর সঙ্গে এবং দীর্ঘদিন মেগাফোন কম্পানীর সঙ্গে জড়িত থাকেন। সংগীত জগতে যেসব শিল্পী তুলসীবাবু রচিত গান রেকর্ড করে খ্যাত হয়ে ওঠেন তাদের মধ্যে নাম করতে হয় ১) কমলা ঝরিয়া—। 'সফল যামিনী আজিলো, কুঞ্জে এসেছে প্রিয়া (তিলক কামোদ) কমলা ঝরিয়ার সর্বপ্রথম রেকর্ড সংগীত। ২) শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী (বড়) "ওগো অসীম দূরের পিয়া— ৩) মাণিক মালা—কেন ফাগুন এলে যাতনা দিতে ৪) আব্বাস উদ্দিন—"ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে কাশের বনের ফাঁকে। ৫) স্বর্গতঃ জ্ঞান গোস্বামী—'আজ নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়—প্রভৃতি। গীত রচনার সঙ্গে নাট্য-মঞ্চে সুরকার রূপেও যোগদান করেন তুলসীবাবু। স্টার রঙ্গমঞ্চ তখন আর্ট থিয়েটারের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত—আর পরিচালনার পুরোভাগে তখন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তুলসীবাবুর পরিচিত শ্রীশিক্ষতীশ রায়চৌধুরীর মারফৎ তুলসী বাবু 'স্বয়ম্বরা' নাটকের সংগীত পরিচালক হিসেবে আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেন। এই প্রসংগে মেগাফোন কম্পানীর ভগবতী চট্টোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বয়ম্বরা নাটকের সুর যোজনা করে তুলসীবাবু ১০০৲ টাকা পারিশ্রমিক পান। এরপর পোষ্যপুত্র ও মন্দির নাটকেও সুর সংযোজনা করেন। অর্থাৎ মঞ্চে তুলসীবাবু সুর সংযোজিত সর্বপ্রথম নাটক স্বয়ম্বরা। দ্বিতীয়—পোষ্যপুত্র তৃতীয়—মন্দির। তুলসীবাবুকে অভিনয়ের জন্যও অনুরোধ করেন অপরেশচন্দ্র। কিন্তু পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হিসেবে তিনি যোগদানে ইতস্ততঃ করেন। পোষ্যপুত্র নাটকে শ্যামাকান্তের চরিত্রে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি অভিনয় করেন না। কেবল একবার মাত্র চিরকুমার সভা নাটকের এক বিশেষ অভিনয়ে চন্দ্রর ভূমিকায় অভিনয় করেন। (অক্ষয় নয়)

চলচ্চিত্রে সর্বপ্রথম অভিনয় করেন হীরেন বসু পরিচালিত 'নির্বাক হাস (চুপ) চিত্রে। তুলসীবাবু রচিত সবাক চিত্রে রূপায়িত সর্বপ্রথম কাহিনী হচ্ছে—'যমুনা পুলিনে' ১৯৩২ খৃঃ নির্মিত হয়। এজন্য পারিশ্রমিক পান ৫০০ টাকা। এরপর সংগীত পরিচালক হিসেবে কালী ফিল্মস স্টুডিওতে যোগদান করেন মাসিক ১০০ টাকা মাহিনাতে এবং মণিকাঞ্চন, দাতা বিনয়ের নিষ্কাম ছাতা দান

প্রভৃতি আরো ছোট ছোট কমেডি চিত্রের পরিচালনা ও কাহিনী রচনা করেন এবং অভিনয়ও করেন। এজন্য অবশ্য পৃথক পারিশ্রমিক পান। সাবিত্রী চিত্রের পর শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্মস এ ১৫০ টাকা মাহিনাতে যোগদান করেন এবং কেরাণীর জীবন, একটী কথা, মায়াকাজল প্রভৃতি প্রহসনগুলি রচনা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সোনার সংসার চিত্রে তুলসী লাহিড়ীর উল্লেখযোগ্য অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফিল্ম করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার 'রিক্তা' ছবির কাহিনী রচনা করেন। রিক্তার হিন্দি রূপও বম্বে থেকে তুলসীবাবুর জীবিতাবস্থায়ই চিত্র রূপায়িত হয়। এরপর তুলসীবাবুকে বহু চিত্রের কাহিনীকার পরিচালক, সুরকার ও অভিনেতা রূপে আমরা দেখতে পাই। এবং কিছুদিন তিনি শিল্প জগত থেকে বিদায় নিয়ে জলপাইগুড়ি যান। এখানে করতোয়া নদীর তীরে ১৫০ বিঘা ধান জমি ও ৬০ বিঘা উঁচু জমি কিনে চাষাবাদ শুরু করেন। ৩ ৪ খানা লাঙ্গল কেনেন। এখানেই রচনা করেন দুঃখীর ইমান নাটক। পরবর্তী কালে এই দুঃখীর ইমান নাটকই নাট্যাচার্য শিশির কুমারের প্রযোজনায় অধুনা লুপ্ত শ্রীরঙ্গম নাট্য-মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। দুঃখীর ইমান 'সর্বহারা' নামে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় চিত্র রূপায়িত হয়। এরপর নাটক রচনা ও নব নাট্যান্দোলনেই তুলসী বাবুকে ব্যাপৃত থাকতে দেখি। বহুরূপী সম্প্রদায় অভিনয় করেন পথিক ও ছেঁড়াতার। ১৯৫৩ খৃঃ লেখেন বাংলার মাটি; চোরাধীনতা নামেও আর একখানি নাটক লেখেন। তুলসীবাবুর পরিণত বয়সের বেশীর ভাগ নাটকগুলিই রূপ-মঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—যার মধ্যে ভিক্তি, নববর্ষ, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার, নায়ক, কৌশল, গ্রীনরুম, ঝড়ের মিলন প্রভৃতির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রঙমহল কর্তৃপক্ষ ভিক্তি নাটক মঞ্চস্থ করবেন বলে তুলসীবাবুর জীবিতাবস্থাতেই স্থির করেন। এবং ভিক্তির চিত্র রূপও বিক্রীত হয় বলে শোনা গিয়েছিল। চাষী নামে তুলসীবাবুর আর একটি কাহিনী পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আংশিক চিত্ররূপ পেয়ে বন্ধ হয়ে যায়। রাজেন তরফদারের সর্বপ্রথম চিত্র অন্তরীক্ষের কাহিনীও রচনা করেন তুলসী লাহিড়ী।

তুলসীবাবুর জীবিতাবস্থাতেই তার জীবনী রূপ-মঞ্চ পত্রিকায় চতুর্দশ বার্ষিক শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাই নট, নাট্যকার ও সংগীতজ্ঞ তুলসী লাহিড়ী সম্পর্কে যেসব তথ্য বর্তমানে প্রকাশ করা হলো—তা অভ্রান্ত। □

শতবর্ষের প্রণাম

দেবনারায়ণ গুপ্ত

যতদূর মনে হয়, তিরিশের দশকের মাঝামাঝি বা তারও পরে কোন এক সময়ে তুলসী লাহিড়ীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। উনি তখন জে. এন. ঘোষের মেগাফোন কোম্পানীতে কাজ করছেন। আমার একটি নাটিকা রেকর্ডিং-এর জন্য নির্বাচন করেছিলেন জে. এন. ঘোষ। সেইটা দেবার জন্য মেগাফোন কোম্পানীতে গিয়েছিলাম। জে. এন ঘোষের একটা স্বভাব ছিল কেউ গেলে তাকে কিছু না কিছু খাওয়াতেন—নিদেনপক্ষে মিষ্টি। তা মিষ্টি টিষ্টি খেয়ে নাটিকাটি দিয়ে চলে আসব এমন সময় তুলসীবাবুকে দেখিয়ে ঘোষ মশাই বললেন—এ'কে চেনেন? আমি একটু থতমত খেয়ে জানালাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন চিনবোনা? কতবার ছবিতে দেখেছি। উনি অভিনেতা, সুরকার গীতিকার এবং—

—এবং?

—এবং একজন উকীল।

এই কথা শুনে তুলসীবাবু একটু হেসে বললেন—সব ঠিক আছে, খালি ওই উকীলটা বাদ দেন। ধড়াচূড়ো পরে দিনকয়েক আদালতে ঘোরাঘুরি করেছি বটে তবে কিনা পোষালো না। অভিনয়, গান বাজনা ভাল লাগে। রংপুরে আমাদের বাড়িতেও গান বাজনার রেওয়াজ ছিল। ওকালতি আমার একদম ভাল লাগেনি। তাই ওসব ছেড়েছুড়ে এই লাইনেই থেকে গেলাম।

কথাবার্তায় এরকমই সহজ ছিলেন তুলসীদা। অত্যন্ত সজ্জন নিষ্ঠাবান শিল্পী। থিয়েটার ও সভাসমিতি সূত্রে তাঁর সাথে অনেকবার অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম। কোনরকম আত্মাভিমান ছিলনা তাঁর। কী পেলেন, কী পেলেননা, কে কী দিলেন বা দিলেন না, এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথাই দেখিনি কোনদিন। কী মঞ্চে কী চলচ্চিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখে বারবার মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর লেখা ও অভিনীত 'পথিক', 'ছেঁড়াতার', ইত্যাদি নাটক বহুরূপী সংস্থাকে অতি অল্প সময়ে বিখ্যাত করে দিয়েছিল। বছর কয়েক বাদে কি হয়েছিল জানিনা। সবিতাব্রত, কালীপদ সরকার, গীতা তাদুড়ী, এদের সাথে তুলসীদা বহুরূপী থেকে বেরিয়ে এলেন। তৈরী হল রূপকার।

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় তাঁর নাটক 'দুঃখীর ইমান' দেখেছি। রংপুরের নিজস্ব স্থানীয় ভাষায় লেখা—অসাধারণ নাটক। ভোলা যায়না। সে যুগে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল এ নাটক। পেশাদার মঞ্চে এ নাটক ছিল এক মস্ত ব্যতিক্রম। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রচলিত নাট্যবোধকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল 'দুঃখীর ইমান'।

আমি এখন ৮৮ বছরের বৃদ্ধ, শয্যাশায়ী, সব কথা মনে করতে পারিনা। তুলসীদার জীবদ্দশায় একমাত্র 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' ছাড়া তাঁর আর কোন নাটক বোধহয় বই হয়ে বেরোয়নি। এসব নিয়ে তাঁর কোন উদ্বেগও ছিলনা। তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করা খুব শক্ত ছিল। ভাবুক মানুষ। গান, বাজনা, অভিনয় নিয়ে মগ্ন থাকতে চাইতেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে থাকার সুযোগ হয়নি আমার। ১৯৫৫ সালে আমি স্টার থিয়েটারে পরিচালক হিসেবে যোগদান করি। এ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ তাঁর অসুস্থতার সময়েও বিশেষ খোঁজ খবর করতে পারিনি। শুনেছিলাম উনি কখনো ও'র দমদমের বাড়িতে, কখনো দক্ষিণ কলকাতায় কমলা ঝরিয়ার বাড়িতে থাকতেন। আমার সঙ্গে কমলা ঝরিয়ার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলনা। বাড়িটাও চিনতামনা। কমলাকে নাকি তুলসীদাই এনেছিলেন এবং বড় সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাঙলা থিয়েটারে তুলসীদা একটা নতুন পথ—নতুন ধারার সৃষ্টি করে-ছিলেন। যা পরবর্তীকালে এ থিয়েটারকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তাঁর জন্য এ পোড়া দেশ জীবদ্দশায় তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা কিছুই দেয়নি। আজও তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ণ হয়নি। এই জন্ম শতবর্ষে আপনারা তাঁকে স্মরণ করছেন—অনুসন্ধান করছেন—তাঁর কথা লেখার উদ্যোগ নিচ্ছেন দেখে এই অশক্ত শরীরেও আনন্দবোধ করছি। তাঁর মতো একজন প্রকৃত শিল্পতাপসের মূল্যায়ন না হওয়া সমাজ ও দেশের পক্ষে লজ্জার। সেই নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও আপোষহীন শিল্পী তুলসীদাসকে আজ আমার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঢেলে অসংখ্য প্রণাম জানাই। □

[বাঙলা রঙ্গমঞ্চের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব দেবনারায়ণ গুপ্ত দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় প্রায় শয্যাশায়ী। ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তাঁর শয্যাপার্শ্বে এক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একুশ শতাব্দীর জন্য লেখাটি অনুলিখন করেছেন **বিদিশা রায়**]

একটি নিঃশব্দ শতবর্ষ ঃ তুলসীদাস লাহিড়ী

শুভ জোয়ারদার

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সারা জীবন একাতারে দিয়ে যান, বিনিময়ে পাননা কিছুই। মানুষটি যদি সৃষ্টিশীল হন, যদি সেই সব সৃষ্টির মধ্যে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে, তাহলে একদার 'না-পাওয়া' সেই মানুষটির সৃজনকর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত কিছু খোঁজাখুঁজি, কিছু মূল্যায়ন আমাদের করতেই হয়, অন্তত শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তুলসী লাহিড়ীর জন্মশতবর্ষে এই কথাগুলি খুব অনিবার্যভাবেই এসে যায়।

একমাত্র চারুকলাকে বাদ দিলে তৎকালীন বাঙলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রায় প্রতিটি ধারায় তুলসী লাহিড়ীর অবদান অনস্বীকার্য। গীতরচনা-সুরসংযোজনা-নির্দেশনা, নাট্য-রচনা-মঞ্চাভিনয়-পরিচালনা, চিত্রনাট্য নির্মিতি-চিত্রাভিনয়-চলচ্চিত্র পরিচালনা এবং পরিশেষে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (IPTA) সভাপতির পদ অলংকরণে তাঁর সাংস্কৃতিক পদচারণার পরিধিটি যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আদ্যন্ত শিল্পসচেতন, সমকালীন সময় ও সমাজ সম্পর্কে এতাদৃশ স্বভাবক্রিয়াশীল মানুষটির ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন, সৃজনকর্মগুলির চরিত্র মূল্যায়ণ, শতবর্ষের বিবর্ণ পটভূমিতে তাঁর মত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের প্রাসঙ্গিকতা—এ সব নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা আজ অত্যন্ত জরুরি।

জন্ম ও কর্মজীবন

তুলসী লাহিড়ীর জন্ম ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল। গোটা ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ পটভূমি হয়ে ফুঁসছে। সামন্তবাদী শোষণ শাসনের এই আর্থ সামাজিক বাতাবরণে, সামন্ততান্ত্রিক এক জমিদার পরিবারে তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন। জন্মস্থান ঃ অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার সন্নিকটে নলডাঙা গ্রাম। পিতা রংপুর জেলার 'ডিমলা এস্টেটের' দেওয়ান

ও সেকালের বিখ্যাত কর্নেট বাদক সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মাতা শৈলবালা দেবী। মজার কথা হলো ৪ এপ্রিল ১৮৯৭ যে শিশুটির জন্ম হলো নলডাঙার জমিদার পরিবারে, তার নাম কিন্তু তুলসীদাস ছিল না। সে ছিল হেমেন্দ্রচন্দ্র। হেমেন্দ্র কেমন করে তুলসীদাস হলেন? সে আর এক গল্প। এক স্কুলপড়ুয়া কিশোরের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার এবং প্রতিবাদের ইতিহাস।

ঔপনিবেশিক শোষণে অস্থির নির্যাতিত দেশবাসী তখন টগবগ করে ফুটছে। ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালি জাতির বৃটিশ বিরোধিতার কারণে 'বিভাজন ও শাসন' এই নীতিতে লর্ড কার্জন বাঙলাকে দু'টুকরো করার চক্রান্ত করলো। অগ্নিগর্ভ এই পটভূমিকায় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠলো সারা দেশে। গ্রাম শহরে ছড়িয়ে গেল থিয়েটার ক্লাব আর শরীরচর্চার আখড়াগুলির আড়ালে গুপ্ত সমিতির কর্মকান্ড।

বড়দের সঙ্গে মহিলা ও কিশোররাও সামিল হয়েছিল সেদিনের সেই প্রতিবাদ আন্দোলনে। পারিবারিক সুরের জগতে বড় হতে থাকা হেমেন্দ্রকে ইতিমধ্যে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে। স্কুলের বাতাবরণ এবং প্রশাসন ছিল পুরোপুরি ইংরাজের অধীনে। স্কুলে পড়তে পড়তেই বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও তার গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে আসেন বালক হেমেন। স্বদেশীদের ডাকে নিজের (ইংরাজ নিয়ন্ত্রিত) স্কুলের সামনে পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করার জন্য তাকে শুধু সেই স্কুল থেকেই বিতাড়িত করা হলো না, ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত বিদ্যালয়ে তার শিক্ষার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো।

ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের কোন স্কুলই হেমেন্দ্রকে ভর্তি করবে না। তাই অভিভাবকরা ঠিক করলেন তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে তার পিতামহ তথা কোচবিহার রাজার দেওয়ান শিবচন্দ্র লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে নাম বদল করে পড়াশোনা করবে হেমেন্দ্র। সেই মত কোচবিহার রাজ স্কুলে ভর্তি হলেন তিনি। হেমেন্দ্রচন্দ্র থেকে রূপান্তরিত হলেন তুলসীদাস-এ। কোচবিহারের রাজারা গৃহদেবতা মদনমোহনের উপাসক। 'তুলসীদাস' নামকরণের নেপথ্যে এই বাতাবরণটির প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়। প্রথাগত পড়া-শোনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-শিক্ষার প্রাথমিক পাঠও শুরু হয়েছিল কোচবিহারে। তৎকালীন কোচবিহার রাজার সভাগায়িকা ছিলেন তারাবাঈ। ইনি লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছিলেন এবং দেওয়ান সাহেব তথা শিবচন্দ্র লাহিড়ীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নলডাঙার

বাড়িতে কর্নেট বাদনরত পিতার বাজনা শুনে সেই সুর বাঁশের বাঁশিতে হুবহু তুলে নিয়ে বাজাতে পারতেন তুলসীদাস। দাদুর অভিভাবকত্বে কোচবিহারে থাকাকালীন তাঁর সহজাত সঙ্গীতপটুত্বে মুগ্ধ তারাবাঈ তুলসী দাসকে প্রথাগত সঙ্গীতচর্চার প্রাথমিক পাঠ তথা তালিম দিতে আগ্রহী হলেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে চললো ধ্রুপদী সঙ্গীতের শিক্ষা।

১৯১৯ সাল। কোচবিহার রাজ স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আই. এস. সি. পড়তে এলেন তিনি। ১৯১৭ সালে সসম্মানে আই. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে বিজ্ঞান থেকে এলেন কলায়। বিষয় বদলের সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বদলও হলো। ফের কোচবিহার এসে রাজ কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯১৭ এই মধ্যবর্তী সময়ে ইতিমধ্যে সময় সুযোগ পেলেই এস্রাজ বাজোনোর অভ্যাসে হাত পাকাচ্ছিলেন তিনি। ছুটির সময়ে রংপুরে এসে নাট্যশিক্ষক তারাপ্রসন্ন সান্যালের কাছে নিচ্ছিলেন নাট্যচর্চার প্রাথমিক পাঠ। কলকাতা থেকে কোচবিহারে ফিরে যাওয়ার মূলে ছিলেন কোচবিহার রাজের সভা গায়িকা তারাবাঈ; উদ্দেশ্য: সঙ্গীতে সহজাত দৌহিত্র সুলভ তরুণটিকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাকাপাকি তালিমের সঙ্গে যুক্ত করা। তিনি চাইলেন তুলসীদাস লক্ষ্ণৌ গিয়ে উচ্চতর সঙ্গীতের পাঠ নিক কিন্তু পিতামহ শিবচন্দ্র তাতে সম্মত হলেন না। এক শীতের রাতে সঙ্গীতমনস্ক যুবকটিকে নিয়ে গোপনে কোচবিহার ছাড়লেন তারাবাঈ, গন্তব্য তৎকালীন ধ্রুপদী গানের অন্যতম চর্চাকেন্দ্র—লক্ষ্ণৌ।

তথ্য-নথি থেকে জানা যাচ্ছে তুলসীবাবুর ধ্রুপদী সঙ্গীতের গুরু অন্তত দু'জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মানুষ। একজন লক্ষ্ণৌ-এর (পরবর্তীকালে মরিস কলেজের সঙ্গে যুক্ত) ইসতাক হোসেন। অন্যজন আগ্রা ঘরানার শিল্পী, তৎকালীন ঢাকার নবাবের সভাগায়ক সালামত হোসেন। লক্ষ্ণৌ গিয়ে ইসতাক হোসেনের কাছে তুলসীদাসের 'নাড়া' বাঁধার ব্যবস্থা করলেন তারাবাঈ।

সেখানে ১৯১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত তালিম নিয়ে কলকাতা ফিরলেন তুলসী দাস। ভর্তি হলেন তৎকালীন রিপন, বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আইন বিভাগে। পাশও করলেন সসম্মানে ১৯২৪ সালে। ইতিমধ্যে ১৯২০ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে তুলসীবাবুর বিবাহ কার্যটি সমাধা হয়েছে।

আইনজীবীর ডিগ্রি নিয়ে তিনি প্রথমে এলেন রংপুর আদালতে উদ্দেশ্য আইন ব্যবসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা। কিন্তু সেখানে

তেমন সুবিধা হলো না। রংপুরের মানুষ কলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী অতুল গুপ্তের সহযোগিতায় এলেন আলিপুর জজ কোর্টে। পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠ জনদের কাছে তুলসীবাবু মন্তব্য করেছিলেন যে আইনে ডিগ্রি থাকার সুবাদে সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করার পেশাকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। অতুল গুপ্তের ছোট ভাই বিমল গুপ্ত ছিলেন তুলসীবাবুর বন্ধু স্থানীয়। তাঁরই পরামর্শে ১৯২৭ সালে আইনজীবীর কালো গাউনকে পাকাপাকি ত্যাগ করে গ্রামোফোন কোম্পানীতে মাস মাইনের চুক্তিতে সঙ্গীত পরিচালকের পদে যোগ দিলেন তুলসীদাস। এই সময়ে TWIN কোম্পানীর লেবেলে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, জমিরুদ্দিন খান্ প্রমুখের গাওয়া বেশ কিছু গানের রেকর্ড পাওয়া যায়, যেগুলির গীতিকার ও সুরকার হিসাবে তুলসীবাবুর সৃজনশীল কর্মের চিহ্ন রয়েছে।

১৯২৯ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যুক্ত থাকাকালে তুলসীবাবু এলেন ১ নম্বর গারস্টিন প্লেসের পুরানো রেডিও দপ্তরে। তখন সেখানে মাদুর পেতে শ্রোতাদের সরাসরি গান-বাজনা শোনানো হতো। কর্মকর্তা ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং নৃপেন মজুমদার মশাই। তুলসীবাবু এলেন তাঁর লেখা বিখ্যাত 'ঠিকাদার' নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। সেই বেতার নাটকের অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং স্বয়ং তুলসীদাস লাহিড়ী। ১৯৩১ সালে HUSH (চুপ) নামের নির্বাক চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন রূপালি পর্দার অভিনেতা হিসাবে।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে গান তৈরির কাজ আর বেতারে অভিনয়—এই ভাবেই চলছিল। হঠাৎই গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুযোগ্য পুত্র দানীবাবু তুলসী দাসকে ডেকে তৎকালীন আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনা 'পোষ্যপুত্র' নাটকে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তুলসীবাবু তখন থাকতেন বাগবাজারের বিখ্যাত তবলাবাদক ও ধ্রুপদী গানের পৃষ্ঠপোষক অনাথ বসুর বাড়িতে। পাশের বাড়িতেই থাকতেন দানীবাবু। আর্ট থিয়েটারে সঙ্গীত পরিচালকের পদে যোগ দিয়ে বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে পেলেন বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী শীল, আচার্য আলাউদ্দীন খান, গোপাল লাহিড়ী, মুকুল মণ্ডল, লণ্ঠ বাবুই প্রমুখদের এই সময়ে আর্ট থিয়েটারের ১৪টি প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যুক্ত ছিলেন তুলসীদাস। নথি থেকে জানা যায় 'পোষ্যপুত্র' ছাড়া 'তটিনীর বিচার,' 'নার্সিং হোম,' 'মন্দির,' 'মেঘমুক্তি,' 'স্বামীস্ত্রী'

ইত্যাদি নাটকগুলির নাম সেই সময়ের থিয়েটার মনস্ক মানুষজনের মুখে মুখে ফিরতো। আর একটি তথ্য থেকে জানা যায় যাত্রাপালাতে সুরকার হিসাবে অন্তত একবার যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সেটা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালে শাঁখারী পাড়ার 'ভক্তের ডাক' পালাতে। গায়িকা-নায়িকা ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা পেশাদার অভিনেত্রী মানিক মালা।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি তুলসীবাবু মূলত কাজ করেছেন নানান গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে। এই সময় সেকালে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা গায়ক গায়িকা তাঁর কথায় ও সুরে তাঁদের কণ্ঠ সংগীত রেকর্ড করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জমিরুদ্দীন খান, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কমলা ঝরিয়া (দিং), মিস মানিকমালা, অশ্চর্যময়ী দাসী, রাজলক্ষ্মী (বড়), মিস লাইট, আঙুর বালা, ইন্দুবালা, সরযূ বালা, রানীবালা, হরিমতি, বিজয়া দাস (চলচ্চিত্রকার সত্যজিত রায়ের স্ত্রী), কাজি নজরুল ইসলাম, আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ শিল্পীরা। রেকর্ড করা হয়েছিল বেশ কিছু নাটক আর কৌতুক-নকশা। ১৯২৯ সালে কাজি নজরুল ইসলাম তুলসীবাবুর সহকারী পদে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগ দেন। সে কালে রেকর্ডের লেবেলে শিল্পীদের নামই ছাপা হতো শুধু। নেপথ্যের সৃজনশীলতা হিসাবে গীতিকার ও সুরকারদের কোন স্বীকৃতি ছিল না। এই নিয়ে কোম্পানীর কর্তাব্যক্তি ভগবতীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তুলসীবাবুর বিরোধ বাধে। তুলসীবাবু ও কোম্পানীর শব্দযন্ত্রী তথা গীতিকার হীরেনবাবু গ্রামোফোন কোম্পানী ছেড়ে চলে আসেন। সঙ্গে আসেন কাজি নজরুল ইসলাম, জ্ঞান গোস্বামী প্রমুখ। এঁরা সকলেই পরে মেগাফোন কোম্পানীতে যোগ দেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, লেবেলে গীতিকার—সুরকারদের নাম উল্লেখ না থাকার কারণে এই সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করা তুলসীবাবুর অনেক গান কাজি নজরুলের নামে ভুলবশত এখনো বাজারে চলে। মেগাফোন কোম্পানীতে যুক্ত হওয়ার পরে যে সকল শিল্পীরা তাঁর গান রেকর্ড করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : রাধারানী দেবী, ভবতোষ ভট্টাচার্য, নৃপেন মজুমদার, উত্তরা দেবী, মনোরমা দেবী, সতী দাসগুপ্ত (বি এ) বীরেন্দ্র নাথ বল, উমা দাশ প্রমুখ। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত কমবেশি ২০০টির মত গান তুলসীবাবুর কথা ও সুরে বিভিন্ন কোম্পানী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনে প্রচারিত হয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্রের 'দেবদাস' নাটক। নাম ভূমিকা ও পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন সেকালের

বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রমথেশ বড়ুয়া। শিল্পী তালিকার উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, যমুনা দেবী এবং চুনীলালের ভূমিকায় স্বয়ং তুলসীদাস লাহিড়ী।

ইতিমধ্যে সঙ্গীত জগত ও থিয়েটার পাড়াকে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্র জগতেও অভিনেতা, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, চিত্রপরিচালক হিসাবে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তুলসীদাস। শুধুমাত্র পরিচালক হিসাবেই যুক্ত ছিলেন ১১টি ছায়াছবির সঙ্গে। একটি ছবি 'সর্বহারা' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার নির্দেশিত এই ছবিটির (১৯৪৭) কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার গীতিকার, সঙ্গীত পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে তার সৃজনশীলতার বলিষ্ঠ সাক্ষর পাওয়া যায়। দুঃখের কথা ছবিটি কোন অজানা কারণে মাত্র দু'সপ্তাহ চলার পরে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে তুলে নেওয়া হয়। এই বিষয়ে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে সুধী প্রধান বলেছিলেন যে, সমকালীন দেশবিভাগ বিষয়ে তুলসীবাবুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বস্তুবাদী প্রতিফলন ছিল ছবিটির মধ্যে। আর সেটাই তৎকালীন নেহেরু সরকারের যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে দু'জন রাশিয়ান চলচ্চিত্র গবেষক ছবিটি দেখতে আগ্রহী হলেও, তা সম্ভব হয়নি এবং এই ছবিটির কোন প্রিন্ট অথবা নেগেটিভ কোথাও পাওয়া যায়নি।

১৯৪৩ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতিতে সারা দেশ জুড়ে মন্বন্তর। তেভাগা আন্দোলন। এই সময়ে আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন তুলসীবাবুর সহোদর এবং স্বনামধন্য বংশীবাদক গোপাল লাহিড়ী। এই ঘটনায় মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত তুলসীবাবু গোপাল লাহিড়ীর পরিবার বর্গকে নিয়ে চলে আসেন জলপাইগুড়িতে পৈত্রিক জমিদারী দেখাশোনা করতে। এই সময়ে নিজেদের খামার বাড়ির গোলা খুলে দিয়ে মন্বন্তর পীড়িত চাষীদের পাশে দাঁড়ান তুলসীদাস। রচিত হয় মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দুঃখীর ইমান'। এই সময়ে সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত হয় গাইবান্ধাতে। সম্মেলন সভাপতি কবি সজনীকান্ত দাসের আমন্ত্রণে কৃষক জীবনের বঞ্চনার পটভূমিতে লেখা 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি পাঠ করে শোনান তুলসীবাবু। উল্লেখযোগ্য যে এই মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা সর্বকালের ভারতীয় নাটকের মাইল স্টোন হিসাবে চিহ্নিত 'নবান্ন, নাটকের কিছু আগেই তুলসীবাবু তার 'দুঃখীর ইমান'এর পান্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। নাটকের

বিষয়বস্তু এবং শিকড়গন্ধী আবেদনে অভিভূত হয়ে সজনীকান্ত তাঁকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ করেন। উদ্দেশ্য : ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে নাটকটির মঞ্চায়নের প্রস্তুতি নেওয়া। গণনাট্য সংঘের ধর্মতলা স্ট্রিটের দপ্তরে তখন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, সুধী প্রধান, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, ত�ৃপ্তি মিত্র নিত্য যাতায়াত করছেন। মূলত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের আগ্রহে তুলসীবাবু গণনাট্য দপ্তরে এলেন সঙ্গে সদ্য লেখা 'দুঃখীর ইমান'এর পাণ্ডুলিপি। নানা কারণে 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি গণনাট্য সংঘে মঞ্চস্থ হয়নি।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় 'নবান্ন' নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের নাট্য ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হলো। তুলসীবাবু পরবর্তীকালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন এবং পরে তাঁকে আমরা সংঘের সভাপতি পদ অলংকৃত করতে দেখি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা কবলিত কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কের পীস কনফারেন্সে তুলসীবাবু 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি দ্বিতীয়বার পাঠ করেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অনুরোধে। তৎকালীন কৃষক আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পটভূমিতে লেখা নাটকটি সেই সময়ের রাজনৈতিক তথা সামাজিক বাতাবরণ নির্মাণে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, এটা বোঝা যায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সজনীকান্ত ও সুধী প্রধানের নানা সময়ে করা নানান মন্তব্য থেকে। গণনাট্য সংঘ নয়, 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় তৎকালীন শ্রীরঙ্গম ও বর্তমানের বিশ্বরূপা থিয়েটারে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির প্রযোজনায়। পেশাদারী মঞ্চের ব্যতিক্রমী প্রযোজনার নজির হিসাবে এটি একটি ইতিহাস হয়ে আছে। গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় তুলসীবাবুর প্রথম নাটক 'নাট্যকার'। ১৯৪৭ সালে যে কারণে তাঁর 'সর্বহারা' সমস্ত চিত্রগৃহ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেই একই কারণে ঐ একই সময়ে তুলসীদাস রচিত ও সুরারোপিত কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে গাওয়া গান 'আনাড়ি কাণ্ডারী আজ ডুবলো বুঝি দেশের তরী' ও 'চৌর্যানন্দ' নাটকের রেকর্ডটি নিষিদ্ধ করা হয় তৎকালীন সরকারের নিষেধাজ্ঞায়। ১৯৫০ সালে গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে আসেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তুলসীদাস লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায় সহ অনেক সংস্কৃতি কর্মী। তৈরি হলো ভারতের প্রথম গ্রুপ-থিয়েটার 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী। তুলসীবাবুর লেখা 'পথিক' নাটকই ভারতবর্ষের প্রথম গ্রুপ-থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা।

দ্বিতীয় প্রযোজনাটিও তুলসীদাসের বহু আলোচিত নাটক 'ছেঁড়াতার'। এই প্রযোজনাটি মঞ্চস্থ করেই বাঙলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'বহুরূপী' গোষ্ঠীর নামটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে যায়। এর পরে ওঁরা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন তুলসীবাবুর লেখা ও একদা নিষিদ্ধ হওয়া তির্যক ভঙ্গীর নাটক 'চৌর্যানন্দ'।

বহুরূপীতে মতানৈক্যের কারণে সেখানে বছর ৪/৫ এর বেশি থাকেননি তুলসীবাবু। বিরোধটি আসলে হয়েছিল শম্ভু মিত্র আর সবিতাব্রত দত্তের মধ্যে, তৃপ্তি মিত্রের আপন বোন গীতা 'ভাদুড়িকে নিয়ে, যিনি পরবর্তীকালে সবিতাব্রতের ঘরণী হয়েছিলেন। তুলসীবাবুর সঙ্গে সেই সময়ে বহুরূপী ছেড়ে চলে আসেন সবিতাব্রত দত্ত, গীতা ভাদুড়ী, কালীপদ সরকার, ইসরাইল প্রমুখ। ১৯৫০ সালে আর একটি সময় সচেতন নাট্য-উপহার দিয়েছেন বাঙলা-থিয়েটারকে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে সেই সময়ে তিনি রচনা করেন 'বাংলার মাটি'। ভারতীয় ক্রান্তি সংঘের প্রযোজনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় নাটকটি ১৯৫২ সালে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের সর্বভারতীয় সম্মেলনে। নাটকটিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, কালীপদ চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার দাস এবং তুলসী লাহিড়ী স্বয়ং।

১৯৫৪ সালে মঞ্চস্থ 'বাংলার মাটি' প্রযোজনার মূল কুশীলবদের উদ্যোগে তৈরি হয়, সবিতাব্রত দত্তের নেতৃত্বে প্রথমে 'আনন্দম', পরে রূপকার নাট্য গোষ্ঠী। তুলসীবাবু জন্মক্ষণ থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে, 'চীন-ভারত মৈত্রী সমিতি'র প্রযোজনায় রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয় লু সুনের 'নিউ ইয়ার্স ডে স্যাকরিফাইস' অবলম্বনে তুলসীবাবু রচিত নাটক 'নববর্ষ'। বিশেষ একটি চরিত্রে ছিলেন তুলসীবাবু নিজে, সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস।

মধ্য পঞ্চাশের দশকে আবার এলেন চলচ্চিত্রে মূলত সত্যজিত রায়ের অনুরোধে। সত্যজিতের 'জলসাঘর', 'পরশ পাথর', তপন সিংহের 'অতিথি' চলচ্চিত্রে তাঁর সংবেদনশীল অভিনয়ের কথা আজও অম্লান।

বঙ্গ সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে তাঁর কর্মজীবনের তিনটি দশক ধরে নিরলসভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তুলসীদাস লাহিড়ী। বিনিময়ে পাননি কিছুই। শেষ জীবনে রোগে ভোগে, আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যে ও অনেক অভিমানে প্রচারের অন্তরালে সরে এসেছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সিরোসিস অফ লিভার নামক দুরারোগ্য

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে পিজি ও পরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ চালাতে হতো বলে কপর্দকহীন তুলসীবাবুর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে এসেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে কালীশ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, স্টার থিয়েটারের শিল্পী / কর্মীদের নাম উল্লেখযোগ্য। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ২২ জুন সন্ধ্যে ৬টায় তাঁর স্নেহের পাত্রী ও শিল্পী কমলা ঝরিয়ার বাড়িতে (১৫৮সি রাসবিহারী এভিনিউ) তিনটি দশকব্যাপী নিরলসভাবে সমাজ সচেতন সৃজনশীল কর্মে বঙ্গ সংস্কৃতির (সংগীত নাটক চলচ্চিত্র) ধারাকে পুষ্ট করেছেন যিনি সেই তুলসীদাস লাহিড়ীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর মাত্র। তাঁর শেষ সময়ে কাওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন উৎপল দত্ত, ডঃ সতী রায়গুপ্ত, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, সুধী প্রধান প্রমুখ সংস্কৃতি জগতের মানুষজন।

শতবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা

এ কথাটা ঠিক যে আদ্যন্ত গুণী, সমাজমনস্ক ও স্বভাব শিল্পী তার জীবদ্দশাতে যেমন ছিলেন, তেমনি এই শতবর্ষ পূর্তির কালেও পাদপ্রদীপের অন্তরালে রয়ে গিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে সমাজমনস্ক এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিল্পকর্ম এমন কি এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও যখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তখন সমকালীন সমাজ থেকে তিনি এতটা বিচ্ছিন্ন হলেন কি ভাবে এবং কেন ?

সঙ্গত এই কৌতূহলের নিরসনের জন্য বলা যায় যে এর জন্য দায়ী আংশিক ভাবে তুলসীবাবু নিজে আর যতটুকু বাকি থাকে তার জন্য দায়ী করা যায় আমাদের মত ঔপনিবেশিক দেশের কূপমন্ডূকতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালো-বাজারী অর্থের দ্বারা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা আর 'সাংস্কৃতিক জগতে 'মধ্যবিত্তসুলভ' গোষ্ঠীতন্ত্র। ১৯২৯ থেকে ১৯৫৯ দীর্ঘ এই তিনটি দশক ধরে তুলসীবাবু তাঁর গান—নাটক—সিনেমার মাধ্যমে বাঙলা সংস্কৃতিকে যতটা পুষ্ট করেছেন, বিনিময়ে কতটা ফেরৎ পেয়েছেন বাঁচবার রসদ সংগ্রহের লক্ষ্যে ? বরং বিপরীত দিকে বলা যায় প্রতিপক্ষ নয়, নিজের শিবির থেকেই বহুবার পেয়েছেন বঞ্চনা, অবিশ্বাস, অপমান এবং চরম উপেক্ষা। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না

যে তিনি মানুষ হিসাবে অত্যন্ত তীব্র আত্মসম্মানবোধযুক্ত এবং ব্যক্তিসচেতন পুরুষ ছিলেন। ফলে পেশাদার, অপেশাদার, বামপন্থী ও বাণিজ্যিক সমস্ত মত ও পথের সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। তিনি বিশেষ কোন গোষ্ঠীর 'আপন জন' ছিলেন বলে দাবী করেন না কেউ। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করতেন না বটে, তবে সমকালীন সমস্ত সামাজিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার বীজমন্ত্র শুনিয়েছেন তাঁর প্রতিটি কলাকর্মে। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, সমাজের প্রতি তাঁর সংজ্ঞাত দায়বদ্ধতা থাকলেও সমাজের কোন দায়বদ্ধতার তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না প্রাথমিকভাবে তাঁর বা পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারের ওপরে। তিনি যেমন নিজের আচরণ বা আপন শিল্পকর্মের সমালোচনায় উদার ছিলেন, অন্যদিকে যুক্তিহীন ফরমায়েশ কখনো বরদাস্ত করেন নি। ফলে পেশাদারী জগতে তিনি ক্রমশই বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিলেন। নীতিগত তো দূরের কথা এমন কি 'কৌশলগত' কারণেও অপছন্দের কোন সুরে সুর মেলাতে চাননি কোনদিন, যে কোন ভাবে প্রচারের আলোকবৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়া আর সেটাকে ধরে রাখার 'কলা-কৌশল' কে চিরকালই মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছেন তুলসীদাস। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এ যে পথচলা, এটা স্রোতের বিরুদ্ধে। স্রোতের অনুকূলে 'গা ভাসিয়ে দেওয়া' তত্ত্বে কোনদিনই বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। ফলে প্রায় নিঃসঙ্গ একা লড়তে লড়তে একেবারেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর এই অনমনীয় ঋজু মানসিকতার জন্যই পরিচিতরা তাঁর কাছে কখনো 'অন্য' ধরণের প্রস্তাব নিয়ে যেতে অবশ্যই দ্বিধায় থেকেছেন। অন্যদিকে প্রচারের আলো যার দিকে কিংবা যে দিকে থাকে, সাধারণ মানুষের ঝোঁক থাকে সেদিকেই। এটাই স্বাভাবিক, মনোবৈজ্ঞানিক কারণে। তাই, এতাদৃশ নানাবিধ কারণের যোগ-বিয়োগ অথবা পারমুটেশন কম্বিনেশনে জনমানসে শৈল্পিক অভিঘাত জানতে যতটা সফল বা সার্থক তুলসীদাস, তার তিরিশ শতাংশও পরিচিত বা জনপ্রিয় নন, সাধারণ মানুষের কাছে।

ব্যক্তি তুলসীবাবুর জনপ্রিয়তার বিষয়টি ততটা গুরুত্বপূর্ণ তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীটি আপন শিল্পকর্মে প্রতিফলনের প্রাসঙ্গিকতাটি। তুলসী লাহিড়ীর শতবর্ষে এই অমোঘ প্রশ্নটিই আমাদের যে ভাবেই হোক হাজির করেছে মুখোমুখি এক দায়বোধের সামনে। তুলসীবাবুর জীবনাদর্শ এবং তাঁর শিল্পকর্মগুলির মূল্যায়ণের সামনে এসে মূল দুটি বিষয় আমাদের কাছে

অনুধাবিত হয়। প্রথমটি হলো তদানীন্তন গড্ডালিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে আপোষ-হীন মনোভাব আর অপরটি হলো সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃংখলার প্রতিবাদে সৃজনধর্মী কাজকর্ম। একটা কথা মাথায় রাখা দরকার যে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী রক্ত তাঁর শরীরে প্রবাহিত হলেও তিনি কিন্তু সময়ের নিরিখে যথেষ্ট সচেতন আর আধুনিক ছিলেন। ভাবধারার দিক থেকে 'মৌল-নন্দনতান্ত্রিক' হলেও সেই নান্দনিক অভিঘাতগুলিকে বহুর কল্যাণে সমাজ মঙ্গলের স্বার্থে মেলাতে এতটুকু দ্বিধা দেখান নি। যে কারণে ধ্রুপদী সঙ্গীত জগতের মানুষ হয়েও তিনি লিখতে পারেন 'আনাড়ি কান্ডারী আজ ডুবলো বুঝি দেশের তরীর মত সময় সচেতন গান। হঠাৎ বড়লোক হওয়া কালোবাজার প্রেমীদের বিরুদ্ধে লেখা 'চৌর্যানন্দ', তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে কৃষক জীবনের মর্মন্তুদ দলিল 'দুঃখীর ইমান', দেশভাগের অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় লেখা 'সর্বহারা', সাম্প্রদায়িক অনন্য নজির হিসাবে চিরকালীন নাটক 'বাংলার মাটি'—এই সব অমূল্য সৃজনকর্ম অনিবার্যভাবেই তুলসী দাসের আর এগুলি বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নিশ্চয় অক্ষয় হয়ে থাকার মত। এত কিছু করে তুলসীবাবু আসলে তাঁর সাংস্কৃতিক তরবারিটি তুলেছিলেন আমাদের অবক্ষয়ী মূল্যবোধের পচনশীল মানসিকতার বিরুদ্ধে।

বিশ্বায়নের চটকদারী মোড়কের খোলামেলা বাতাবরণে তৃতীয় বিশ্বের শিকড় সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে আজ যে সর্বতোভাবে নোংরা আক্রমণের চক্রান্ত ফাঁদা হয়েছে, সেই সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে তুলসীবাবুর ভূমিকা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যে সকল সংগঠিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখনো ভুলেও আপোষ করেন নি, যে অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তিনি বার বার সোচ্চার হয়েছেন, ঠিক সেই সামাজিক ক্ষতগুলিই আজ মাতৃভূমির গোটা গায়ে বিসদৃশভাবে সংক্রামিত। সব দেখেশুনে, সামান্য বিচার বিশ্লেষণের পরে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আজকের এই সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্দশার ছবিটি তুলসীবাবু নিশ্চিতভাবেই আগাম দেখেছিলেন। সেই হিসাবে তাঁকে ভবিষ্যদ্রষ্টা অবশ্য বলা যায়। আজ তাঁর শতবর্ষ চলছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তেও যদি তাঁর জীবন আর শিল্পকর্মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আমরা একটু অনুভাবিত না হই, দায়িত্ব না বোধ করি তবে আর কবে তা সম্ভব হবে। □

নাট্‌কে তুলসীদাস

সাগর বিশ্বাস

নাট্‌কে তুলসীদাস
কাট্‌কে ঘোড়ার ঘাস
ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল
মিটলোনা তার আশ।

১৯৫৯ সালে তুলসী লাহিড়ী মারা গেলে, প্রখ্যাত গায়িকা কমলা ঝরিয়ার বাড়ি থেকে যখন তাঁর সমস্ত জিনিষপত্র স্ত্রী শান্তি লাহিড়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়—তখন একটুকরো ছেঁড়া কাগজে উপরোক্ত পদ্যটুকু পাওয়া গিয়েছিল। তুলসী লাহিড়ীর নিজের হাতে লেখা ছন্দোবদ্ধ প্রাণের আর্তি ও আত্মসমালোচনার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। কটাক্ষ শুধু নিজেকে নয়, যে সামাজিক, বাতাবরণের মধ্যে শিল্পীর আকাঙ্খা পূরণ হয় না—যাবতীয় নিষ্ঠা ব্যর্থতার জঞ্জালে পরিণত হয়, তীব্র কটাক্ষ সেই সমাজকেও। সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নিজেকে। কারণ ব্যক্তি তো সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অন্তত তুলসী লাহিড়ীর দৃষ্টিভঙ্গীতে তো নয়ই।

শান্তি লাহিড়ীর হাতে যাবতীয় জিনিষ ও বইপত্র তুলে দেওয়া হলেও ছেঁড়া ওই কাগজের টুকরোটুকু সুধীপ্রধান রেখে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের কাছে। একথা গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৯৭ মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে সুধী প্রধান বর্তমান লেখককে বলেছেন। প্রায় ৪০ বছর সুধীদা ওই ছিন্ন কাগজের টুকরো সযত্নে রক্ষা করেছেন। আজ তিনি নেই। তাঁর যাবতীয় নথি ও বইপত্র এখন বাঙলা আকাদেমির হেফাজতে রাখার কথা হচ্ছে। জানিনা সেই ছোট্ট কাগজের টুকরোটুকু কারো সন্ধানী চোখে ধরা পড়বে, না কি ছেঁড়া কাগজের বাক্সে চলে যাবে! ২৯শে নভেম্বর সুধীদার যে সাক্ষাৎকার টেপ করা হয় তার মূল বিষয়ই ছিল তুলসী লাহিড়ী। সেদিন তাঁর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে মৃত্যুর সামান্যতম ছায়াও ছিলনা। পুরো তিন ঘন্টা কথা বললেন। কি প্রানবন্ত কথা—শিশুর মতো দিলখোলা হাসি। তখন কে জানতো যে এটাই হবে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার!

তুলসী লাহিড়ী সম্পর্কে সুধীদার ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। গুণী মানুষই গুণীর মর্যাদা বোঝেন। চল্লিশের দশকে যখন 'নবান্ন' নাটকের মহড়া চলছে তখন গণনাট্য সংঘের ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসে তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি নিয়ে আসেন। সুধীদা তখন সংঘের অন্যতম প্রধান সংগঠক। 'দুঃখীর ইমান' বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'র আগে লেখা নাটক। পাণ্ডুলিপি পড়ার পর 'দুঃখীর ইমান' ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গণনাট্য সংঘ এ নাটক মঞ্চস্থ করতে সম্মত হয় না। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি তখন 'জনযুদ্ধ' নীতি গ্রহণ করেছে। নাটকের মধ্যে পুলিশ অফিসারকে নায়কোচিত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে নাটকটি অন্য সবদিক থেকে গ্রহণযোগ্য হলেও নীতিগত কারণে বাতিল করা হয়। কিন্তু এ নাটকে জাতিধর্মের উর্ধে রুষককে যে অবস্থানে দেখানো হয়েছে তার তুলনা নেই।

পরে শিশির ভাদুড়ী যখন নাটকটি শ্রীরঙ্গম মঞ্চে প্রযোজনা করেন তখন স্বাধীনতা পত্রিকায় সুধীদা দুই দুইবার নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা সূচক আলোচনা লেখেন। শম্ভু মিত্রের বহুরূপী যদি সেই সূচনাপর্বে তুলসী লাহিড়ীর মতো অভিনেতা এবং 'পথিক' কিংবা 'ছেঁড়াতার'এর মতো নাটক না পেতো তাহলে ইতিহাস হয়তো বা অন্যভাবে নির্মিত হতো। সুধীদার মতে, খলচরিত্রে তুলসীদার মতো শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ছিলেন বলেই বিপরীতে শম্ভু তৃপ্তির অভিনয় অতটা খুলতে পারতো। তুলসীদা না থাকলে শম্ভু-তৃপ্তির উত্থান ওভাবে হতো কিনা সন্দেহ। কয়েক বছর পরে সেই বহুরূপীও ছাড়তে হয়েছে তুলসী লাহিড়ীকে। মানুষটা কখনও আপোষ করতে জানতেন না। রফা করে টিকে থাকা এবং টিকে থেকে আলোর মুখে আসার কৌশলটা তিনি কোন-দিনই রপ্ত করতে পারেননি। জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ভূম্যধিকারকে মেনে নিতে পারেননি, পুঁথিগত শিক্ষাকে ধ্যানজ্ঞান না করে সঙ্গীত নাটককে ভালবেসেছেন—যে ভালবাসা একদিন গোপন অভিসারের মতো ঘর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে গেছে তাঁকে। ওকালতি পাশ করে ও আদালতকে জীবিকার কেন্দ্র হিশেবে মেনে নিতে পারেননি—কারণ সেখানে সত্য ও মিথ্যার রঙ কথার জালে একাকার হয়ে যায়। গ্রামোফোন রেকর্ডে গীতিকারের নাম উল্লেখিত না থাকার প্রতিবাদে গ্রামোফোন কোম্পানী পরিত্যাগ করেছেন। শেষমেষ গণনাট্য সংঘও পরিত্যাগ করেছেন। ১৯৫৭ সালে সংঘের যে সভায় সুধীপ্রধান পদত্যাগ পত্র পেশ করেন সে সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন

তুলসী লাহিড়ী। এরপর সংঘের সাথেও আর দৃঢ় সংযোগ রাখেননি। কিন্তু তার প্রতিটি নাটক ও গানে গণনাট্যের কথা উচ্চারিত হয়। দুঃখী মানুষের কথা, শ্রমিক কৃষকের কথা, সত্যসন্ধানী আদর্শ মানুষের কথা। মার্কসবাদ পড়ার সময় পাননি—পড়তে চেয়েছিলেন—মৃত্যুর হাতছানি সেখান থেকেও তাঁকে অসময়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তবুও তাঁর রচিত অজস্র সঙ্গীত, নাটক, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচারের দাবি রাখে। সুধীপ্রধান বলেছেন, 'বিজন মার্কসবাদ পড়ে যা পারেনি তুলসীদা না পড়েই তা করতে পেরেছেন।'

আর পাঁচটা মানুষের মতো তুলসী লাহিড়ীও ঘর বেঁধেছেন। কিন্তু যে ঘরে নাটকের পাণ্ডুলিপি ছেলের দুধ গরম করার কাজে ব্যবহৃত হয়, সে ঘরই বা কতক্ষণ তাঁর আশ্রয় হতে পারে! তাই দেখা যায়, জীবনের শেষ শয্যা রচিত হয়েছে তাঁরই প্রীতিধন্যা শিল্পী কমলা ঝরিয়ার ঘরে। বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলের মেয়ে কমলাকে অপরিসীম স্নেহ,ভালবাসা ও আনুকূল্য দিয়ে খ্যাতির শীর্ষে তুলে এনেছিলেন তুলসী লাহিড়ীই। কমলা তাকে বাবু বলে সম্বোধন করতেন। তিনিও আদর করে বাবু বলতেন কমলাকে। সুধীদা বলেছিলেন, 'শিল্পীর প্রেম।' হতেই পারে। অনেক শিল্পীর জীবনেই হয়েছে। কিন্তু তুলসী লাহিড়ী অন্য অনেকের মতো স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তথা আপন সংসারের প্রাণকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। রাতে কমলার বাড়িতে থাকলেও সকালবেলা ঠিক দমদমে নিজের বাড়িতে চলে যেতেন। সংসারের প্রতি দায়দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করেছেন। বাগুইআটিতে ৪ কাঠা বাড়ির জমিও কিনেছিলেন। কিন্তু নগদ টাকা জমাতে পারেননি। মৃত্যুর সময় তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে শ'পাঁচেক মাত্র টাকা ছিল। তাও ছিল সম্ভবত টাকাটা চেকে এসেছিল তাই। ক্যাশ হলে হয়তো জমাই পড়তো না।

যে কমলাকে তাঁর স্নেহাশ্রয়ে মানুষ করেছিলেন এবং নিজেও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন কমলার কাছে সেখানেও নিজেকে অবাঞ্ছিত আবিষ্কার করার মধ্যে যে মর্মান্তিক ব্যথা থাকে সে ব্যথাও একদিন বুক ভরে সইতে হয়েছে তাঁকে। দুরারোগ্য ব্যাধি (সিরোসিস অব লিভার) যখন তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে, বন্ধু ও গুণমুগ্ধদের সাহায্যে হাসপাতালে চিকিৎসাও ব্যর্থ ও দুর্বহ হয়ে পড়েছে তখন কমলার বাড়িতে কখনো কখনো কটূকথাও শুনতে হয়েছে। সে সময় তাঁর সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে, প্রস্রাব পায়খানা ধারণ করার ক্ষমতা নেই। সুধীদা বলছেন 'সিঁড়ি থেকেই • একদিন শুনতে পেলাম—কমলা খুব গালাগালি

করছে তুলসীদাকে। আমার এত খারাপ লাগলো যে আমি সেইদিনই তাঁকে ওখান থেকে নিয়ে যাব বলে দিলাম। সব ব্যবস্থা করে পরদিন যখন গেলাম— তুলসীদা তাঁর রোগ পাণ্ডুর চোখ তুলে আমার দুটি হাত ধরে কাতরকণ্ঠে বললেন —'সুধী, কমলাকে ক্ষমা করো।'

ভালবাসা মানুষকে বিশেষত শিল্পী মানুষকে কত কাঙাল করে তা সেদিন তাঁর চোখের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। পাছে ওঁরা তাঁকে কমলার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন! জীবনে অনেক ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য তাঁকে লড়তে হয়েছে। প্রেম ভালবাসা সেও বুঝি এক রক্তাক্ত সংগ্রাম। কমলার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য হৃদয়ের কম রক্ত ক্ষরিত হয়নি। কিন্তু জীবনের উপলব্ধ সত্য থেকে বিচ্যুত হবার মানুষ ছিলেন না তিনি। মেজ ছেলে দিনেন্দ্র চন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন 'কী এক ভয়াবহ রূপের সাধনায় তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন যে জন্য নিঃস্ব রিক্ত জীবনের ছায়াপটে মহাকালের যাত্রায় শিল্পী তুলসীদাস এক নিঃসঙ্গ পথিক সেদিনও, আজও। দেবনারায়ণ গুপ্তর চোখে তিনি ছিলেন ভাবুক মানুষ, গান বাজনা নিয়ে থাকতেন। তাঁকে কলকাতার বাইরে থেকে লেখা কমলার একটা চিঠিতেও এ কথার সমর্থন মেলে, 'বাবু,...আমার মনে হচ্ছে কলকাতা চলে যাই কত লোক ত আছে তেমনি আমিও থাকবো। অন্য কিছুর জন্য নয় শুধু এইজন্য যে ওখানে রেওয়াজটা হবে।' বুঝতে অসুবিধে হয়না যে শৈশবের সঙ্গীতপ্রিয়তা একদিন জীবনের মগ্নতায় পরিণত হয়েছিল আর কমলা সেই মগ্নতারই তপস্বিনী হয়ে চরণ ছুঁয়েছিলেন। মন্থিত জীবনে সুধাই তো সব সত্য নয়, হলাহলও ওঠে। সে বিষও তাঁকে আকণ্ঠ পান করতে হয়েছে। সঙ্গীত ও শিল্পের বিচিত্র ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েও নিজেকে আজীবন তিনি নাট্যশিল্পী হিসেবেই মনে করেছেন। তাই অভিজ্ঞতা ও অসুস্থতার মধ্যে উপলব্ধ জীবনসত্য নিয়ে বলেছেন 'সুধী, আমি মার্কসবাদ পড়িনি, কিন্তু একবার যদি বেঁচে উঠি, আগুন জ্বালিয়ে দেব দেখো।' কিন্তু সে যে বৃথা আশা তাও জানতেন।

মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েই হয়তো কোনদিন জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসেব করতে গিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় হৃদয়ের গভীরতম আর্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিল তির্যক ভঙ্গীতে। অসতর্ক সেই চারটি পংক্তি এক নিঃসঙ্গ শিল্পসাধকের মর্মবাণী শুধু নয়, সমকালীন সমাজেরও এক ব্যঙ্গচিত্র হয়ে রইলো। □

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

তুলসী লাহিড়ীর শিল্পকর্ম

নাট্য রচনা : দুঃখীর ইমান, পথিক, ছেঁড়াতার, নাট্যকার, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার, বাংলার মাটি, নববর্ষ, চোরাধীনতা, ভিত্তি, নায়ক, কৌশল, গ্রীনরুম, ঝড়ের মিলন।

সৌখীন অভিনয় : পরপারে, মিশর কুমারী, দত্তা, চিরকুমার সভা।

সৌখীন নাট্য পরিচালনা : মিশর কুমারী। নাট্যরূপ : দত্তা।

প্রথম গীতরচনা : ১৯২৯ এইচ. এম. ভি.তে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ রেকর্ড করেন।

প্রথম সুর সংযোজন : স্বয়ম্বরা (আর্ট থিয়েটার)।

প্রথম পেশাদার অভিনয় : চিরকুমার সভা (আর্ট থিয়েটার)

প্রথম চিত্রাভিনয় : Hush (চুপ) নির্বাক—পরিচালনা হীরেন বসু

প্রথম চিত্রনাট্য : যমুনা পুলিনে

অন্যান্য চিত্রনাট্য : কেরানীর জীবন, দাতা বিনয়ের নিষ্কাম ছাতা দান, মণিকাঞ্চন (১ম), মণিকাঞ্চন (২য়),একটি কথা, হ্যাপি ক্লাব, মায়াকাজল, পরাণ পণ্ডিত, রিক্তা, ঠিকাদার, ফিভার মিকচার, ভালবাসা, বিজয়িনী, পথিক, অন্তরীক্ষ, চাষী।

চিত্র পরিচালনা : কেরাণীর জীবন, মণিকাঞ্চন (২য়), একটি কথা, দাতা বিনয়ের নিষ্কাম ছাতা দান, বেজায় রগড়, হ্যাপি ক্লাব, মায়াকাজল, পরাণ পণ্ডিত, ফিভার মিকচার, বিজয়িনী, ভালবাসা, চোরাবালি।

চিত্রাভিনয় : Hush (নির্বাক), মণিকাঞ্চন (১ম), কেরাণীর জীবন, শচীদুলাল, মানময়ী গার্লস স্কুল, মণিকাঞ্চন (২য়), একটি কথা, বেজায় রগড়, বাঙ্গালী, সোনার সংসার, হ্যাপি ক্লাব, বিষবৃক্ষ, মায়াকাজল, বেকার নাশন, প্রভাস মিলন, হালবাংলা, পরশমণি, পরাণ পণ্ডিত, রিক্তা, মহাসম্পদ, ঠিকাদার, রাজকুমারের নির্বাসন, ফিভার মিকচার, উত্তরায়ণ, বিজয়িনী, ভালবাসা, গৃহলক্ষ্মী, মানে না মানা, এই তো জীবন, নতুন বৌ, নিবেদিতা, নিমাই সন্যাস, পথ বেঁধে দিল, তুমি আর আমি, সর্বহারা, রামপ্রসাদ, মানুষের ভগবান, সংঘাত, আমাদের সিরাজ, দিগভ্রান্ত বামুনের মেয়ে, রাত্রির তপস্যা, মন্দির, চোরাবালি, মৌচাকে ঢিল, পথিক, জলসা ঘর, ক্ষণিকের অতিথি।

শেষ অভিনয় : চলচ্চিত্র—ক্ষণিকের অতিথি
নাটক—লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার

[যথাসম্ভব সামগ্রিক হলেও এ তথ্যপঞ্জী সম্পূর্ণতার দাবি রাখছেনা—সম্পাদক]

● গল্প

হেলিকপ্টার, চটের বস্তা এবং গুপি

মৃদুলকান্তি দে

পার্ক স্ট্রিট— জওহরলাল নেহরু রোড ক্রসিং। ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষমান জনতা।

নীল আকাশ। জলপাই-রঙ হেলিকপ্টার এইমাত্র উড়ে গেছে। সাদা পোষাক-পরা দু'জন সার্জেন্ট মোটরবাইক চড়ে চারপাশ দেখছে। পরিচ্ছন্ন মর্যাদাসম্পন্ন মোড়। একটা লাল বাস ছুটে গেল। কী শব্দ! দেশি-বিদেশি টিভি সংস্থার ব্যস্ত কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করল ভুরু কুঁচকে। হেলিকপ্টার উড়ে এলেও শব্দ হয়। সেই শব্দ অভিজাত উচ্চতা থেকে একরকম দ্যুতি ছড়ায়। বা ঘুণ্যন। ঘুণ্যন এমন মূর্চ্ছনা বিকশিত করে, মনে হয়, অজানালোক থেকে দেবদূত দেখছে ফুটপাথ-বন্দি সার সার মানুষ। ঘড়ির কাঁটা তখন সকাল ন'টার ঘরে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সবরকম আয়োজন নিখুঁত এতটাই যে, জেব্রা ক্রসিং ধরে এখন পারাপার সম্ভব নয়।

একজন পুলিশ অফিসার গাড়ি থেকে নামলেন। ক্রসিং-এ রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে ট্রাফিক আইল্যান্ড আছে বাঙলা ব অক্ষরের মত, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখেমুখে শ্রদ্ধা —অনন্ত গাম্ভীর্য। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালেন তিনি। রাস্তার ওধারে ফুটপাথ ঘেঁষে বাঁশের ব্যারিকেড। উৎসুক অপেক্ষমান মানুষ কৌতূহলী চোখে দেখল, একজন কনস্টেবলকে ডেকে পুলিশ অফিসার কী নির্দেশ দিয়েছেন। বড় বড় পা ফেলে কনস্টেবলটি হেঁটে যায়। ইতিমধ্যে আরো দুজন পুলিশ অফিসার ট্রাফিক আইল্যান্ডের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আগে ব্যাপারটায় কেউ নজর দেয়নি কেন? অপেক্ষাকৃত বিসদৃশ ব্যাপার, তবু কারুর চোখে পড়ল না! আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ দর্শক টিভির পর্দায় চোখ রেখে অপেক্ষা করছেন। রোদ ঝলমল চারিদিক। তবু আজ দিনটা অন্যরকম বলেই মনে

হতে পারে, ট্রাফিক আইল্যান্ডের ব্যাপারটা ছোট্ট একটা খুঁত ধরে রেখেছে। সব থেকে বড় কথা, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের মাথায় হাজার হাজার মানুষ কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চোখেও কি পড়েনি! পড়েছে নিশ্চয়ই, সেভাবে কেউ ভেবে দেখেনি যে ওটাকে খুঁত বলা যেতে পারে।

আবর্জনা নয়, বা উড়ন্ত কাক ঠোঁট থেকে ময়লাও ফেলেনি। সাধারণ মানুষ বড় বড় হোর্ডিংয়ের লেখাগুলো অত মন দিয়ে পড়ে না, বড় বড় রাস্তার পাথরকুচি নিয়েও মাথা ঘামায় না।

হাত বাড়ালে সবুজ ময়দান। পা বাড়ালে গাছ গাছালির ছায়া। সকাল-বেলার সবুজ ছায়ায় কাগজকুড়োনি বসেছিল। গুপি। খালি পা। পায়ের নখগুলো ময়লা। ঢলঢলে প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত। বেঢপ গেঞ্জি পুরনো হতে হতে শ্যাওলার মত শান্ত রঙ ধারণ করেছে।

"কী রে, হাওয়া খাচ্ছিস!" কনস্টেবলটি কাছে এসে দাঁড়াল।

"বড় রাস্তা ধরে কতটা পথ হেঁটে এলাম। এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পেলাম না, স্যার।" গুপি বলল। বয়স বারো বছর। কাগজ কুড়োনোর কাজ শুরু করবার সময় হারিয়ে যাওয়া শৈশবের পরণে ছিল রুক্ষ ধুলো।

"তোর কপাল ভালো। ছেঁড়া কাগজ নিবি, চল।" কনস্টেবলটি হাতের তালু দিয়ে গুপিকে ইশারা করল, ওঠ। চটপট চটপট।

একজন বাচ্চা শ্রমিক হারানো শৈশব যেভাবে দেখে, তার চেয়েও অবাক চোখে গুপি সাদা পোষাক পরা কনস্টেবলকে দেখল। সে উঠে দাঁড়ায়। এই কনস্টেবলটির গোঁফ নেই, তবে হাতের তালু খুব শক্ত। ঘাসের ওপর থেকে গুপি তাপ্পি লাগানো চটের বস্তা কাঁধে তুলতেই সাদা পোষাক হা হা করে ওঠে।

"ওটা থাক। পরে এসে নিবি।"

"স্যার, হারিয়ে যাবে।" গুপি সোজা তাকালো।

"কে নেবে তোর ছেঁড়া জিনিস? রাখ ওটা।" ভর্ৎসনা শুনে গুপি রেখে দিল গাছের গোড়ায়।

ঢলঢলে প্যান্ট পরে গুপি হাঁটছে। আগে আগে সাদা-পোষাক। অপেক্ষ-মান জনতার ভিড় ঠেলে রাস্তায় নেমেছে গুপি। চওড়া রাস্তা পার হচ্ছে গুপি। ঢলঢল প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত নেমে গেছে। "স্যার, আজ দোকানপাট বন্ধ কেন?"

ক্ষুদে বালকটির প্রশ্ন ছিল। ব-অক্ষরসুলভ ট্রাফিক আইল্যান্ড থেকে পুলিশ অফিসারের হাতছানির তাড়ায় প্রশ্নটি নিরুত্তর থাকে।

ট্রাফিক আইল্যান্ডের এখানে-ওখানে পলেস্তারা খসে পড়েছে অনেক আগেই। ভাঙা জায়গাগুলো সারাতে হয়েছে কাল রাত্তিরে। আইল্যান্ডের ওপরটুকুতে সিমেন্টের পালিশ চড়িয়ে পুরনো খবর কাগজ চাপা দেওয়া ছিল। সিমেন্ট শুকিয়ে গেছে। খবর কাগজ আটকে আছে সিমেন্টের সঙ্গে। ট্রাফিক আইল্যান্ডের ধার ঘেঁষে কাগজগুলোর প্রান্তভাগ বাড়তি পাতার মত লেগে আছে। সুসংবদ্ধ চারদিক, সেনাবাহিনীর ইস্তিরি করা জামার মতন। এরকম পরিবেশে ভেবে দেখলে, সিমেন্টের চাতাল থেকে বেরিয়ে আসা খবর কাগজের আলগা প্রান্তভাগ দৃশ্যত ছন্দপতন ঘটায়। দৃশ্যত সাদা-পোশাক পরা অনেক পুলিশ আইল্যান্ড ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

আর মাত্র কয়েক মিনিট। অন্তিম যাত্রার শোকমিছিল এই পথ দিয়ে যাবে। প্রথমে কফিন-বাহী শকট। পিছনে কুড়ি গাড়ির কনভয়। রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো মানুষ অপেক্ষা করছে, এই আসবে, আজ শেষ প্রণাম জানাবে অসংখ্য মানুষ।

গুপি আইল্যান্ড থেকে টেনে টেনে ছিঁড়ছে আলগা কাগজ। টুকরো কাগজগুলো রাস্তার পাশে জড়ো করে রাখছে। সময় খুব কম। অন্তিম যাত্রার শোকমিছিল এক্ষুনি এসে পড়বে এই দিকে। পুলিশ তাড়া দিচ্ছে, "হাত চালা চটপট।" লাল মোটরবাইক চেপে একজন সার্জেন্ট চলে গেল, শোকমিছিল আসছে। বিদেশি টিভির লোকজন রীতিমত বিরক্ত। রাস্তার মাঝখানে ট্রাফিক আইল্যান্ড। বাচ্চা ছেলেটা কাগজ ছিঁড়ছে আইল্যান্ড থেকে। সেটাই ওদারক করতে ব্যস্ত কিছু পুলিশ। শোকমিছিলের যাত্রাপথটাই আড়াল হয়ে যাচ্ছে না! মধ্য-ইউরোপের একজন হাতের ইশারায় সরে যেতে বলল গুপিকে। গুপি দেখতে পায়নি। দেখবে কি! মাথা নীচু করে সে কাগজ ছিঁড়ছে টেনে টেনে। একজন আমেরিকান টিভি ক্যামেরাম্যান অস্থায়ী মাচার ওপর বিরক্তিসূচক ঘাড় নাড়ল, কী হচ্ছে!

রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা ভিড়ের ভিতর সাড়া জাগে। আসছে। মাথা রোদ থেকে বাঁচাবার জন্য কয়েকজন ছাতা খুলেছিল, চটপট তারা ছাতা বন্ধ করল। গুপির ঢলঢলে প্যান্টের তলা হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। বলা যায়, রাস্তার মধ্যিখানে সাধারণ মানুষ বলতে গুপি একা। সে কাগজ ছিঁড়ছে।

এইসময় আকাশপথে সশব্দে উড়ে এলো হেলিকপ্টার। নীলশূন্যে হেলিকপ্টার দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর আরো নেমে এলো। সাঁ সাঁ ঘুরছে হেলিকপ্টারের পাখা। ট্রাফিক আইল্যান্ড বরাবর অনেকটা নীচে নেমে এসেছে। শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকে হেলিকপ্টার, একটানা শব্দ ছড়ায়। সেইসঙ্গে বাতাস। পাখা কাপটানো বাতাসের ধাক্কায় কাগজ-টুকরো ছড়িয়ে পড়ে এলোমেলো। বাতাসের তীব্র ঘূর্ণী ছেঁড়া কাগজ ওড়ায়। হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড় দিশাহীন যেন। কাগজ-টুকরো উড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। পুলিশ ব্যগ্রভাবে কাগজ কুড়োচ্ছে রাস্তা থেকে। এক্ষুনি শোকমিছিল আসবে।

অনেকটা নিচে নেমে আসা হেলিকপ্টার দেখছে গুপি। ট্রাফিক আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে সে মাথা উঁচু করে দেখছে, কী বিশাল হংসরাজ। ঠিক তার মাথার ওপর। শব্দ আর বাতাস দুটোই আলোড়িত করে তার অচেনা ভুবন। দু'চোখ ভরা বিস্ময়। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায়। ছোঁ মেরে পুলিশের গাড়ি তুলে নেয় গুপিকে। শোকমিছিল আসছে। হেলিকপ্টার আরো উঁচুতে উঠে গেল। ঘূর্ণি তোলা বাতাসের ঢেউ সরে যায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ তুলে নেওয়া হয়েছে।

সাঁ সাঁ ছুটছে গাড়ি। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য মানুষ। বিস্ময় এবং বিস্ময় কেটে যাওয়া ঘোর গুপিকে তাৎস্রব করে দেয়। সে একা গাছতলায় বসেছিল। হঠাৎ পুলিশ এলো, হেলিকপ্টার এলো, জিপগাড়ি এলো। খালি পা গোত্রহীন একটি বালক মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে পেঁছে গিয়েছিল কাগজ কুড়োনোর জন্য। পুলিশের শক্ত তালুর প্রকাশ্য ইশারায়।

"স্যার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?" ছলছল চোখে গুপি প্রশ্ন করে।

"কোথাও না। নেমে যাবি এক্ষুনি।"

"স্যার, চটের বস্তাটা গাছতলায় রয়েছে।"

"কোথায় ?"

"ময়দানে। বস্তাটা চুরি হয়ে গেলে কাগজ কুড়োব কী করে, স্যার !"

"বড্ড কথা বলছিস। নেমে যা।"

জিপগাড়ি থামে। গুপি নেমে পড়ে। উল্টোদিকে হাঁটতে হবে অনেকটা দূর। ময়দানের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে সে। ফেলে আসা চটের বস্তা তার মনকে ভারী করে দেয়। সে দৌড়য়। বেঢপ গোঞ্জিটা ঢলঢল করছে ! পথতো

অল্প নয়। আরো অনেকটা যেতে হবে। আকাশ চক্কর দিয়ে হেলিকপ্টার আবার এইদিকে আসছে। আন্তর্জাতিক অতিথিরা শোক জ্ঞাপন করতে এসেছেন, নিরাপত্তার জন্য নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা। হেলিকপ্টার উড়ছে আকাশে।

ফেলে আসা চটের বস্তা, সেই গাছটা খুঁজছে গুপি। জায়গাটা এখনো আসেনি। সকাল থেকে সে কিছু খায়নি। পেটের খিদে বুকের খাঁচার মধ্যে ভীষণ হাপায়। আকাশ শব্দ ছড়ায়।

ফুটপাথ থেকে থিকথিকে ভিড় অনেকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। সাদা ফুল দিয়ে সাজানো শকট চলে গিয়েছে একটু আগে। এই সেই গাছটা। গুপি দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন ঝাপসা লাগে চোখের দৃষ্টি। গাছটার কাছে গিয়েও ঝাপসা হয়ে যায় দু'চোখ। চটের বস্তাটা নেই। সে গাছের গুঁড়ির চারপাশ দেখল ঘুরে ঘুরে। বস্তাটা যে পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে গিয়েছিল, সেই পাথরটা আছে। খালি পা'র বুড়ো আঙুল দিয়ে পাথরটাকে গুপি নাড়ায়। টপ টপ জল পড়ছে পাথরটার গায়। এক ফোঁটা, দু'ফোটা। একটু একটু করে ভিজছে পাথর। হঠাৎ সে চমকে ওঠে, এতো জল এলো কোত্থেকে পাথরটার ওপর!

চমকে ওঠে তার জন্মগত বেদনা। নিঃস্বতার শেষ ব্যাথাটুকু খিদের পেটে পুড়ে যায় এক নিমেষে। পোড়া ব্যথাটুকু মুঠোয় চেপে সে গাছে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চোখ তোলে আকাশের দিকে। ডালপালা ছড়ানো সবুজ পাতার সমারোহ গাছময়। সেইদিকে তাকিয়ে শুধু একবার সশব্দ কান্নায় উচ্চারণ করে, মা!

ওপাশ দিয়ে যাচ্ছিল টিনের কালো বাক্স মাথায় কেকওলা।

"বস্তাটা তোর ছিলো?" কেকওলা বলল।

গুপি ফিরে তাকায়, "হ্যাঁ।"

"পুলিশের কুকুর এসে গন্ধ শুঁকেছে।"

"ওটা তো কাগজ কুড়োনোর বস্তা। কোথায় গেলো?"

কেকওলা জবাব দেয় না। সে টিনের কালো বাক্স মাথা থেকে নামাল, ঢাকনা খুলল গাছপালার ছায়ায়। গুপি জল-ভেজা পাথর থেকে সরে এসে কেকওলার বাক্সর কাছে দাঁড়াল।

"কুকুর এই বাক্সটার গন্ধ শুঁকেছে?" গুপির চোখে সরল দৃষ্টি।

"পুলিশ জানে, এটা কেকের বাক্স। গন্ধ শুঁকবে কেন? কেকওলা জবাব দেয়। বাক্সের ভিতর থরে থরে সাজানো কেক।

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

"চটের বাক্সটা কাগজ কুড়নোর, পুলিশ জানে না ?" সরল দৃষ্টির চোখে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ঝলসে ওঠে গুপির।

"ওটা গাছতলায় পড়ে ছিল। পুলিশের সন্দেহ হয়েছিল।"

"ওরাই তো ডেকে নিয়ে গেল আমাকে কাগজ ছেঁড়ার জন্যে। বলল, বস্তাটা থাক। ছেঁড়া জিনিস কেউ ছোবে না। সকাল থেকে কিছু খাইনি।"

হঠাৎ গুপির চোখে পড়ল, একজন লোক হাঁটছে রেড রোডের দিকে। হাতে ছেঁড়া ছাতা। সে দৌড়ে যায়, "এই ছাতাটায় কুকুর গন্ধ শুঁকেছিল ?"

লোকটির পাশে পাশে গুপি হাঁটে। লোকটি গুপির কথা শোনে না। হনহন করে হাঁটছে লোকটি। গুপি লোকটির ছাতা ধরে আচমকা টান দেয়। লোকটি থমকে যায়।

"কুকুর গন্ধ শুঁকেছিল ছেঁড়া ছাতাটার ?" বারো বছরের ছেলে গুপি ক্ষুধাকাতর চোখ তুলে অথবা তেজী শব্দর ঘুণ্যি তুলে লম্বা লোকটির মুখের দিকে তাকালো।

"ছেঁড়া ছাতা ? আমার ছাতা ছেঁড়া, তোর কী অপদার্থ !" লোকটি বিরক্ত হয়।

"কুকুর গন্ধ শুঁকেছিল ?"

"কুকুর ইচ্ছে করলেই গন্ধ শুঁকতে পারবে ? ইঁট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবো না কুকুরের বাচ্ছার। লোকটি গর্জায়। হাঁটে হনহন করে। ঢলঢল করছে গুপির প্যান্ট। গুপি হাঁটছে বড় বড় পা ফেলে, লোকটির পাশাপাশি।

"তবে কুকুর আমার বস্তার গন্ধ শুঁকেছিল কেন ?"

"ইঁট মেরে তাড়াতে পারিস নি ? কোন কুকুর ?"

"পুলিশের কুকুর।"

"ওই যে পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে। দৌড়ে ধর, যা।"

গুপি তৎক্ষণাৎ দৌড়তে শুরু করে। কালো পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়য় গুপি। প্রশস্ত পিচের নিকোনো রাস্তা। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকে সে। অল্প আঁচে পোড়া কাঁচা ভুট্টার দানার মত ছড়িয়ে পড়ে শতাব্দীর প্রবল যন্ত্রণা। ঝলসানো চোখে ঠিকরে ওঠে ক্ষিদের তাপপ্রবাহ, ঘুণার স্ফুলিঙ্গ, পদশব্দ এমন। এই শব্দ সহ্যসীমার মধ্যে গ্রাহ্য হয় না। চক্রবৎ বিরাট পাখা ঘোরে। যান্ত্রিক শব্দতেজ ও তীব্রগতি এককাট্টা হয়, আসমান জমিন ফারাক মুছে দেয়। ফরমান এমন—পদশব্দর বেপরোয়া ধাবমান স্পর্ধায় বালক শব্দমাত্রার অনুমোদিত সীমা লঙ্ঘন করে। জলপাইরঙ ফরমান তখন শব্দরাক্ষস। বালক গুপির মাথার ওপর ধেয়ে আসে। □

● কবিতা

ডি. জে. ইনরাইটের কবিতা
আবু হাসান শাহরিয়ার অনূদিত

১. প্রার্থনাসঙ্গীত

চোখে যদি নামে অফুরান ঘুম
হাতে পেতে চাই আকাশ কুসুম
অপার আকাশে লাগুক না ধুম
অপার আকাশে লাগুক না ধুম
হাতে পেতে চাই আকাশকুসুম
আমার কান্না কখনোই নয় লজ্জার মেঘে রাঙা কুমকুম
না-ই যদি পাই আকাশ কুসুম
অকেজো আকাশও হয়ে যাক গুম ?
জন্মসূত্রে সকলেরই জানা
কড়ি ও বিত্ত সবই তালকানা
এলে যেতে হয়— নিয়ম সেটাই
পৃথিবীরও কিছু
ত্রুটি থাকা চাই
অচেনা আকাশে লাগুক না ধুম
হাতে নিয়ে ধ্রুব আকাশকুসুম ?

২. দখলিস্বত্ব

এবং আর কী চাই, তোমার নিজেরই থাকবে হাসে পালকের সেই কলমখানা
এবং আর কী চাই, তোমার নিজেরই থাকবে ক্ষুদ্র একখানা জলচৌকি
এবং আর কী চাই, তোমার নিজেরই থাকবে লক্ষ্যীমন্ত পড়ার টেবিল
এবং আর কী চাই, তোমার নিজেরই থাকবে 'যাকে পাই তাকে ছো'র সেই দুরভাষ
এবং আর কী চাই, তোমার নিজেরই থাকবে একজন একান্ত সচিব
এবং আর কী চাই, তোমার নিজেরই থাকবে ব্যক্তিগত এক কম্পিউটার
এবং আর কী চাই, তোমার নিজেরই থাকবে শেষপারানির সেই কড়ি
এবং তোমার বিদায়-সংবর্ধনাও হবে একান্ত তোমারই

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

৩. কৃত্যসূচি

স্বরের স্বরভঙ্গিকেও
শব্দের থারস্থ হতে হয়
আগন্তুক স্বর আর শব্দেরা থাকে
বোধ আর চিন্তার তিপান্তরে
আবার কখনো সখনো তাদের কুড়িয়ে আনতে হয় ঘটনা বৃক্ষের পাদদেশ থেকে
চৈতন্যকে আহ্বান করতে হয় ডাক নামে
সুতরাং যতক্ষণ না তুমি ঘটনার শিকার হচ্ছ
যতক্ষণ না নিজেই হচ্ছ চৈতন্যের ডাকনাম
স্বরের স্বরভঙ্গি নিয়ে
তোমার যাত্রারও নেই শুরু ।

নদীতলে মাসুদ খানের সঙ্গে
ব্রাত্য রাইসু

এই পরিবেশবাদী কবিতায়
ঐ মাথা নিচু লেজ উঁচু করে
ঢুকছেন খান মহাশয়

তার নদীকূল আছে নদী তীর

তার ইকোলজিক্যাল ভাবাবেগ
তাকে টেনে নিয়ে যায় সিলিকায়

তার নিশিদিন তারই নিশিদিন
দিন কেন দিন তিনি ভাবছেন
ভেবে খুশি খুশি তিনি লাগছেন
আর তুলে আনছেন মহাকাল
তার পরাবেশবাদী প্রতিভায়
নব অনুভব নব বরিষণ
তব সিলিকন আহা সিলিকন !

যেতে যেতে

প্রমোদ বসু

যেতে যেতে পথে পড়েছিল গাছ
গাছের মতো একরোখা মানুষ।
যেতে যেতে পথে পড়েছিল ধুলো
ধুলোর মতো একাকার খেলা।

দাঁড়াই দু'দণ্ড শুধু তোমার ছায়ায়
একা, এই মৃত্যু ভালোবেসে।
মানুষের খেলার কাছে আজ
সমস্ত জীবন কাঁপে বিষুব রেখায়।

সাবানের কেসে গোটা রবিবার

তীর্থঙ্কর মৈত্র

আমি কি কেবল-ই বোবা দরজা জানালার মতো
আধখানা বি'ধে গিয়ে ভেঙে থাকবো !

অর্পণ, একটা দিন চলে যায়—
এক একটা সূর্যমুখী চমক দিয়ে ফুটে ওঠে,
লাল টুকটুকে সাবানের কেসে শুয়ে থাকে সাদা দেহে
গোটা রবিবার—
ব্রাশ, রেজার, ফুলদানির মতো পারিবারিক গন্ধ নিয়ে পড়ে থাকি আমি
বারান্দায় ভিজে ছাতার মতো হৃদয় শুকোতে থাকে তবু
বালিশে উবুড় হয়ে কেবলই চিঠি লিখি—এলোমেলো দরজা-জানালা
তুমি কেমন আছো সোনা···অতিরিক্ত স্নায়বিক চাপে
টান টান অক্ষরেরা জৈষ্ঠের মাছির মতো ঝাঁক ভাঙে
দ্রুত পায়ে উঠে গিয়ে দেখি ; গোটা বারান্দাটা জেব্রারো রোগীর মতো
কাঁপতে কাঁপতে বি'ধে যাচ্ছে—ফ্যাকাশে আলোয়···
আর কোথাও আকাশ নেই—বাতাস সেই—
শুধু টুকটুকে লাল এই সাবানের কেসে শুয়ে আছে গোটা রবিবার !

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

দিনলিপি

(এস. এস. কে. এম. হাসপাতাল)

সন্তুলাল ভট্টাচার্য

কাশ ফুলের শুভ্রতা মেলে
ভালবাসায় উড়াল
তোমার দু'চোখ পাখির দু'টি
কালো পাথর মসৃণ রাত্রির
ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যে অস্থির
শ্রাবণ শেষ হলেও ঝরছে তির তির ঝর্ণা
নামছে হৃদয় সরোবরে
ভিজে মাটি ঘাস ফুল
প্রশস্ত বাগান হাসপাতাল বাগান
কাঁকড়া নিমের ডালপালা বেয়ে টপ্ টপ্ জল
শুষে নিচ্ছে ওষুধের গন্ধ দক্ষিণ হাওয়ায়
বিদ্যুৎ চমকায় নীল ঘোমটার ফাঁকে মৃত্যুর মুখ হাসে
মায়াবিনী চোখ কখন আড়াল
লালবাড়িটায় নবজাতকের চীৎকার
এখানে প্রতিক্ষণে বাজছে জন্ম মৃত্যুর অকেস্ট্রা

কেন যেন এসময় মনে পড়ে অজস্র নৌকার নৃত্য
ঢেউ ওঠা নামা রায়মঙ্গল হেতালের বন
বুক ঢল ঢল জলে নেমে কিশোর কুমারী রমনীর মাছ ধরার উৎসব
খলসি ফুলের মধু মৌচাক হরিণ
বনবিবির গান বুকের গোপনে বিচরণ
কেন মনে পড়ে মেয়েদের মুখ
নদীর বাঁকে বাঁকানো ধনুকভঙ্গি গুনটানা
ইস্পাত ভাস্কর্যঘন ধীবর শরীর

বিছানায় শুয়ে থাকা আমার শরীর এক বীণা
মৃত্যুভয় অতীত সংগীত তোমার আঙ্গুল বিনা

কে বাজাবে আর
তোমার ভালবাসার হাত
শিরায় শিরায় কী এক মূর্ছনা
বিস্ময়ে বাঙময় বরাভয়
এই মধ্য রাতে তুমি
অসংখ্য পাপড়ির বিন্যাসে দিলে
সূর্যমুখী আলোর চুম্বন ॥

সেই দীপাবলীর লগ্নে

(নৌবিদ্রোহীদের প্রতি জাতীয় নেতৃত্বের হুঁশিয়ারিকে মনে রেখে)

মধু গোস্বামী

বাচ্চাটা বাজি কিনবে বলে
আব্দার ধরেছে,
আর, ওর বাবাটা বলছে :
না, বাজি জ্বালাতে গিয়ে
নিজের হাত পোড়াবে শেষকালে !…
বাবার পকেটে যে পয়সার টান
সেটা বললে তো, আর বাপ হওয়ার ইজ্জতই থাকে না !

সেদিন ছিল,
সময়ের বুকে আগুন ছড়িয়ে দেবার
দীপাবলীর লগ্ন ।
বুকে যাদের সাহসের পুঁজিতে টান পড়েছিল
সেই সব লোলচর্ম চেতনার
সর্দারগুলো,
ওই বাচ্চার বাবাটার মত
হুঁশিয়ারি দিয়েছিল আগুনে পাওয়া ছেলেগুলোকে :
এই অগ্নিকাণ্ডে
তোমরাও পুড়ে মরবে
না, না, আগুন নিয়ে খেলতে যেওনা ।

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

অটোগ্রাফ

ব্রত চক্রবর্তী

ডায়েরির পাতা উলটে ছেলেটি বলল,
এই যে দেখুন, এইখানে। দেখি
দুবছর আগে দেওয়া আমারই অটোগ্রাফ। পাশে অন্যদের।
মা-র সঙ্গে এসেছে ছেলেটি। পাড়ার গলির মোড়ে
বইয়ের দোকান দিয়ে লেখালিখি করে।
মাথা কাজ করছিল না কিছুদিন, ওর মা
বলল। এখন বোধের ঘরে অনায়াস যায়, আসে।
কোথাও লিখতে চাই, শান্ত মৃদু নরম ভঙ্গিতে
ছেলেটি ব্যাকুলতা বোঝায়। একটু সুযোগ করে
দিন না ছেলেকে, ছেলেটাকে। মা বলল।
পাড়ার গলির নদী, নৌকাগুলি, হাতছাড়া
কোরো না কক্‌খনো। নবীন কবির কাঁধে
হাত রেখে বলি, সমুদ্র ছোঁয়ার আগে
এই নদীময় দিনগুলি চেনো। বলতে
বলতে দেখি ছেলেটির মুখ কবছর আগেকার
হুবহু আমার মুখ। সেই আর্তি, সরলতা, নিশপিশ—
আমি ওর অটোগ্রাফ নিই।

ভাস্কর

তাপস রায়

মৃত্তিকার বুক খালি করে উঠে আসা স্ফূর্ত আয়োজন
দীর্ঘ দু'বেলা তুমিও লৌকিক কীভাবে কোমলতা শুষে
ছোটো বড়ো একতাল ওম, রক্ত আভাস
বুকের গ্রন্থি কেটে সুরেলা আকাশ, তুমি অন্তরাল ঢেউ
যেসব চিঠি আসে, কথাহীন প্রতিমায় সাদা
তুমি তারও হও কিছু অনিবার্য, রৈখিক জলজ দ্রবণ
ভাঙা সাঁতারে যতটা হেসেছি আর অসুন্দর জড়িয়ে উঠেছি
কোমরের অন্ধকার থেকে আবক্ষশরীর—তোমার প্রশ্রয়
এক এক প্রচ্ছদ শেষে রঙ উল্টে পাল্টে পাহাড়ের বর্ষপালন

বিপদসীমা
কৃষ্ণা বসু

বিপদ সীমার দিকে বেড়ে যাচ্ছে জল ; বেড়ে যাচ্ছে, উপচিয়ে পড়ছে,
থাকতে পারছে না,—এখনি যদি না তাকে বাঁধ দেওয়া যায়,
এখনি যদি না তাকে আটকের ফন্দী করা যায়, তবে
জল বিপদজনক জল লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর, এত
ভয়ঙ্কর বাড় বেড়েছে এদের, ঘরের ভিতরে ছিল শাসনপ্রণালী,
চির-দাসী-প্রথা,—সেই সব ভেঙে তছনছ করে সেই সব গুড়ো
গুড়ো করে দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে জল, বেড়ে গিয়ে
বিপদসীমার দিকে এগিয়ে চলেছে—

এরপর কোথায় আশ্রয় পাবে সংসার সীমানা আর
পুরুষ প্রতিভা ?

কৃষ্ণকরবী
অনুরাধা মহাপাত্র

কৃষ্ণকরবীকে খুঁজি শূন্য বয়ার মতো বৃষ্টিকণায়,
পাউরুটির ভেতর পিঁপড়েরা গান গায়,
শোক তবু গাথা হয়ে ওঠে ।
আর ডিমগুলি ফেটে পড়ে স্তব্ধ হাওয়ায়
তাড়া খাওয়া বিড়ালের লেজে পাখি ঠোকরায়
'শুনেছো কি ধ্বনি, বাদলের মেঘে মেঘে সাহেবের
ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি মল্লারের রাগে' ?
এমন দিনে, কৃষ্ণকরবী আজ কোথাও প্রবাদ
মুণ্ডিত কুরমী নারীর কেশরাস প্রবচনে ভেসে যায়
আগ্রাসন, আঁধার দীপমালায়
তালপাতায় মাধুকরী বিক্রি হয় ।
করবীর পাপড়ি ছিঁড়ে চক্রাকার হাত ওই কমরেড চীন
পিতল তম্বুরা হয়ে তুমি বাজো পথে পথে
হরিপদ বাউলের ধুন ।

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

বাঁশিওয়ালা

সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

এটা কবিতা, এটা ছবি, এটা ফুল এটা নদী এটা নারী
এই সবই জানা আছে মানুষের
এটা অশ্রু, এটা যুদ্ধ, এটা রক্তপাত
সবই জানা আছে মানুষের
সময় সীমা বলে দিচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুর হার।

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কি চাও
কি কি তোমার পেতে ইচ্ছে করে
বুদ্ধিমানের মত ভেবে উত্তর দাও।

আচ্ছা—একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে এই অবসরে
আপনি কি দাতা কর্ণ
আপনার পদতলে চন্দ্র সূর্য
আপনি কি কোন নেতা
আপনি কি কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা
আপনার হাতে ধরা আছে
যাবতীয় আশা ও অভিশাপ
আপনি কি যাদুকর কিংবা জাহাবাজ
ত্রিকালদর্শী বা ত্রাতা

এটা অশ্রু, এটা যুদ্ধ, এটা রক্তপাত....
এই সব কোন কিছুই প্রয়োজন নেই আমার
সেকি, এরকম মূর্খের মত কথা—বলে কেউ ?
তা হোক, তা হোক, বরং আপনিই দু'হাত পাতুন
বহুদূর থেকে আসছি
আমি একজন বাঁশিওয়ালা
আমার পরিচয় শুধু অগ্নিময়তা॥

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

প্রীতান্তে ফিরে আসে শব্দ ঃ নূতন অভিধান
সমর্পন মুখোপাধ্যায়

আরও কাছাকাছি যে শব্দ সকল
নিয়ত উদ্ধত স্পর্ধা নিয়ে হয় অবোধ ,

আরও রঙিন স্বপ্নের দোটানায়, যখন
এক নিবিড় পর্দায় ফেলি জলছবির ছাপ

প্রিয় বন্ধুদের লিখি পত্র, দিনলিপি
অসংখ্য পাতা ভরা বাঁধানো খাতায়

সাজিয়ে ফেলি পরতে পরতে
ছেঁড়া কথামালা—উপহার ;

তুমি তো জানো, যেমন ঃ যা চাও
তা পাওয়া যায় না—

প্রীত্যন্তে ফিরে আসে যে ঘনিষ্ঠতা
সেই শব্দে রচনা হয় নূতন অভিধান ।

ফ্ল্যাট বাড়ি
সোমক দাস

মানিক চ্যাটার্জি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিল কেন
সুন্দরী স্ত্রী থাকতে
ছেলেমেয়ে থাকতে
বারো হাজার টাকা মাইনের চাকরি থাকতে
এরোপ্লেনে ওড়াউড়ির চাকরি থাকতে
সে গল্প পুরনো হয়ে গেল তিন দিনে
আমাদের মনে পড়লো জীবনানন্দ
মনে পড়লো ইলেকশান সামনের মাসেই
কে জিতবে সে গল্পে মেতে উঠলুম আমরা
বিয়ে না হলেও বাচ্চা হল জি ব্লকের মোটা মেয়েটার

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

পাশের ফ্ল্যাটের সোনালির ভয়ে
নিরুদ্দেশ হয়ে গেল দত্তবাবুর একমাত্র ছেলে
সি ব্লকের নতুন বৌকে তাড়িয়ে দিল শাশুড়ি
দোলের দিন খুব মার খেলো দারোয়ান রামপ্রতাপ সিং
ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী পাল্টালো দু-দুবার
সনাতন সেনের বৌ পাল্টালো
কেয়ার টেকার পাল্টালো
তবু কিছুতেই পাল্টাচ্ছে না মিঠুদার ভাঙাচোরা সাইকেল
পাল্টাচ্ছে না প্রেসিডেন্টের অর্থহীন বক্তৃতার ঢঙ
শুধু, পাল্টে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট
পাল্টে যাচ্ছে সনাতনের বৌ
কিন্তু, পাল্টাচ্ছে না সনাতন
সে ঠিক সকাল দশটায় অফিস যায়, আর
মাঝরাত্তিরে মাতাল হয়ে ফেরে।

নীল-সবুজ ভালোবাসা

তিলোত্তমা বসু

ভালোবাসা, তুমি বিকেলের রোদ !
ক্যামিলিয়া নাম্নী রমনীর মতো নরম সবুজ ;
ঘাসেদের ছায়া এসে ঘেরে যার শুভ্র পদতল
ভালোবাসা তুমি চিকুরে কাশ্মার দাগ,
কচি হাওয়া ছুঁয়ে দেয় গোলাপী ঠোঁটের পাশে
চিকন দুঃখের সাজ।

দূরে গির্জায় ঘন্টার শব্দ, বইএর আলমারির
পাশে ঘন স্মৃতির স্তর। রাত রুপোলি
হয়ে এলে মৃত্যুর রহস্য খুলে যায়।
প্রিয়জনের অপত্য আদরে শরীর হালকা
হয়ে আসে। নির্ভার মাদক আলো কুণ্ডলিনী

ঘিরে নাচে। ভালোবাসা তুমি এইরকম
অনুভূতি। দূরের ট্রেন যেন চলে যাচ্ছে—
চলন্ত মুক্তোর মালা একের পর এক।
ভালোবাসা তুমি বনগাঁ লোকালের গল্প এবং
জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে আসা একজন আশ্চর্য
মানুষের ছবি।

ভালোবাসা তুমি মানেই রক্তের মধ্যে বোল
তুলছে উদ্দাম ব্যথার ঘুঙুর।
ভালোবাসা তুমি প্রপাতের শব্দ, ভয়ঙ্কর বরণের লাল।
ভালোবাসা আমি ভয় পাচ্ছি—আমি চলে যাবো!
ডাকছে—উদাসীনতা আমার মা।

পারানি

চয়নিকা বিশ্বাস

যেতে পারি
যদি ভোর এনে দাও।
যেতে পারি
তোমার দু'চোখে যদি মোহিল আকাশ দেখি।
যাবো,
অ-মত্ত ভালোবাসা নিয়ে
নামলে শ্রাবণ বৃষ্টি।
ওষ্ঠ পুটে যদি আমারই ভালোবাসা থাকে
তাহলেই যেতে পারি।
উদাস বাউল মাটির গন্ধ যদি দাও
যেতে পারি।
যেতে পারি
করতলে যদি পুণ্য করতোয়া বয়।
যেতে পারি—
যেতে পারি নারী তুমি যদি নদী হয়ে যাও।

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

অভয় পঞ্চাশে

কিংশুক রায়

অভয় পাই তো বলি
এ ভাবেও বাঁচা যায়
যদি
বিশ্বাসে থাকে বল
ভালোবাসায় থাকে প্রেরণা
সৃষ্টিতে থাকে আনন্দ।

অভয় পাইতো বলি
তোর মুখে সভ্যতার কথা
মানায় না
স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের
দোরগোড়ায়
বোফর্স থেকে হাওলা কেলেঙ্কারী
সভ্যতার মুখে কালো ঘসে ঘসে
ফেরারী।

অভয় পাইতো বলি
সূর্যের অহংকার নিয়ে
একদিন যে কিশোর
স্বাধীনতার বরমাল্য গলায় নিয়ে
ফাঁসির সোপানে হাসি মুখে
জীবন দিয়েছিলো
আমরা তাদেরই বংশধর
এ স্বাধীনতা
এ গণতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে
আর আমাদের কোন আস্থা নেই !

অভয় পাইতো বলি....

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

অদ্বিতীয়

সন্ধ্যা ভৌমিক

আমি আমার জন্ম দেখি প্রতিদিন
আমি আমার মৃত্যু দেখি প্রতিদিন
আমি আমার সৃষ্টি দেখি নৈঃশব্দে
আমার ধ্বংসের পাশে আমি দাঁড়িয়ে থাকি নির্বিকল্প।

জীবনের প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই জীবনের অভিজ্ঞান। এই সত্যে উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে অপেক্ষমান মুহূর্তের প্রয়োজন।

প্রতি মুহূর্তের আবির্ভাবই জীবনের অদেখা পটভূমি। এই পটভূমির মৌন আয়োজন যুগে যুগে কালের সীমাকে অতিক্রম করে চলে।

চারিদিকের জগৎ যেমন আমার মধ্যে সপ্রাণ তেমনি আমিও জগতের মধ্যে জাগ্রত। এই যে আমার চলা এর শেষ নেই, সীমা নেই।

আমার অবস্থান সব গ্রহে, সব নক্ষত্রে, সকল জীবনে। আমি ব্যাপ্ত আকাশে মেঘে জলে আগুনে।

আমিই জীবনের অপেক্ষমান প্রেম, আমি অশ্রু আমি চাষীর ক্ষেতে কাঙ্খিত ফসল, পাখির কণ্ঠের গান। আমি বাতাসে, আলোয়, আকাশে ঘাসে ঘাসে মাটিতে ধুলোয় রোমাঞ্চিত। আমিই আনন্দ সংগীত।

এই আমি উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত।

আমি কাব্যে শিল্পে স্থাপত্যে আকীর্ণ। এই পৃথিবী আমারই ধ্যানছবি। এই জীবনই ঈশ্বরের বাসভূমি। আমিই তার মধ্যে নিরন্তর অদৃষ্ট।

সেই ভোর। পৃথিবীর অখন্ড সকাল। যে সকালে আমি হাওড়া স্টেশনে একটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ঋণ শোধেরই মতন আমার সন্তান মৃত্যু দেখেছিলাম।

তারপর নদী আর সরোবরের জলে ভেসে গেল সেই পরিপূর্ণ সকাল যে ভাবে সরোবরের জলে পদ্ম ফুটে ওঠে, প্রতিবিম্বিত হয় তার স্বরূপ, তেমনই সেই সহজ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হল এই দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত জীবন।

এমনি কতদিন আস্তাকুঁড়ে, কোপে, ফুটপাথে আমি আমার জন্ম দেখেছি, দেখেছি অনির্বচনীয় মৃত্যু, দেখেছি ধ্বংসে।

আবার এই আমিই আমার সৃষ্টি দেখি নৈঃশব্দে।

ঝাড়গ্রামের লাল মাটির সেই বৃষ্টিস্নাত পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন আমি ভোরের রাশীসতী বাস ধরতে যাচ্ছি তখন হৃদয় জুড়ে ইষ্ট মন্ত্রের মতন অনুরণিত হয়ে উঠে ছিল—একটি লাইন। তারপর ভোরের বাতাসের কণ্ঠেই প্রথম উৎসারিত হয়েছিল অদ্বিতীয় কবিতাটি।

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

সুধী প্রধান

(১৯১১—১৯৯৭)

কল্পতরু সেনগুপ্ত

আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে দেখা করতে গেছি তাঁর ৭৭ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর ঘরে। ছোট্ট ঘর। আমরা কথাবার্তা বলছি, এমন সময় বেশ সৌম্যদর্শন, ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গী এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। কাকাবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি সুধী প্রধান। আপনাদের মতোই সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রাথমিক পরিচয়ের পরে আমি চট্টগ্রামে চলে যাই। কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। দেখতাম অদম্য উৎসাহ ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটা মানুষ অক্লান্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যে কবি-গানের আসর বসে সেখানে রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, রাইগোপাল, হেদায়েতুল্লার মতো নামী কবিয়ালেরা অংশ গ্রহণ করেন। কবিগানে একটা বিষয়ভিত্তিক চাপান উতোর পর্ব থাকে। বেশ মনে পড়ে রমেশ শীল সেদিন 'দুর্ভিক্ষ ও মজুতদার' এই বিষয়টিকে বেছে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ একদিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চাষী ও গরীব মানুষের কথা—অন্যদিকে কালোবাজারের প্রতিনিধি মজুতদারের বক্তব্য। এ নিয়েই চাপান উতোর। তো সেদিনের সেই কবিগান শুনে সুধী প্রধান এতটাই মুগ্ধ ও উজ্জীবিত হয়েছিলেন যে আই. পি. টি. এ. আন্দোলনে কবিগানের সংযুক্তি বিষয়ে উপরমহলে আলোচনা করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক পি. সি. যোশী কবিগানের ক্ষমতা দেখে রমেশ শীলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তার গ্রামের বাড়িতে। জলকাদার রাস্তা ভেঙে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম যোশীকে সেই গ্রামে। এরপর সুধী প্রধানকে দেখেছি একদিকে কবিগানের সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কাগজে লেখালেখি করছেন

অন্যদিকে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় জেলায় কবিয়ালদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলন কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন উপলক্ষে মহম্মদ আলি পার্কে রমেশ শীল এবং লম্বোদর চক্রবর্তীর যে অবিস্মরণীয় কবি-গান পরিবেশিত হয় তার পেছনে সুধীবাবুর ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। বেশি দিনের কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি পর্ষদের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী গ্রামে যে বিরাট কবি-গানের শিবির হয় তার মুখ্য পরিচালক ছিলেন সুধীবাবু। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু কবিয়াল এই শিবিরে যোগদান করেন। অনেক মহিলা কবিও ছিলেন। কবিগানের প্রসার এবং কবিয়ালদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে তাঁর ভূমিকা আগামীদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

নাট্যাভিনয় ও পরিচালনার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ প্রথম থেকেই ছিল। হয়তো কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রেও পেয়েছেন। একসময় তাঁর দাদু কিংবা দাদামশাই মনোমোহন থিয়েটারের মালিক ছিলেন। গণনাট্য আন্দোলনে সুধীবাবুর ভূমিকা সকলেরই জানা। ব্যক্তিগতভাবে আমি 'নবান্ন' সহ তাঁর বহু অভিনয়ই প্রত্যক্ষ করেছি। একসময় দেখেছি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের হলে 'নীলদর্পন' 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি পুরনো ক্লাসিক নাটক মঞ্চস্থ করছেন। আমাদের ক্লাসিক নাটকগুলি কেন অভিনীত হওয়া দরকার তার একটা ব্যাখ্যাও তিনি করতেন।

থিয়েটার, লোকসংস্কৃতি, গণনাট্য, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২০ খানা বই লিখে গেছেন। তারমধ্যে তিন খণ্ডে সমাপ্ত Marxist Cultural Movement in India বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি না লিখলে ভারতবর্ষে আই. পি. টি. এ. মুভমেন্টের এরকম তথ্যভিত্তিক একটি গ্রন্থ আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও একটি বিরাট কাজ করে গেলেন সুধীবাবু। লিখে গেলেন 'সুভাষচন্দ্র ভারত ও অক্ষশক্তি'। যুদ্ধের সময় সুভাষ বসু সম্পর্কে আমাদের ধারনা ছিল অস্পষ্ট। এ বইতে তিনি যেসব অজানা তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে নতুন করে সুভাষচন্দ্র ভারত মূল্যায়ণ করার সুযোগ হবে। আমার মতে এটিই সুধীবাবুর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ। উপরন্তু আমাদের গ্রামীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান তা দেশের মানুষ কোনদিনই বিস্মৃত হবে না। তাঁর মৃত্যু এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল। □

-একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

তথ্য সংযোজন ঃ

বাঙলা ১৩১৮ সালের ১১ই ফাল্গুন চব্বিশ পরগণা জেলার স্বরূপনগর থানা অন্তর্গত সগুনা গ্রামে সুধী প্রধানের জন্ম। পিতার নাম প্রকাশ প্রধান, মা দুর্গা-রাণী। ম্যাট্রিক পাশ করেন বনগ্রামের স্কুল থেকে। কিছুদিন ক্যাম্বেলে ডাক্তারী পড়েছিলেন। ১৯২৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন। কারাবাসের দিনগুলিতে রেবতী বর্মনের সংস্পর্শে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনোর সুযোগ পান। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক মুজফ্‌ফর আহমদের সংস্পর্শে আসেন এবং পার্টির প্রতি অনুরক্ত হন। অতঃপর কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রগতি লেখক সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম সংগঠক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে সাপ্তাহিক বাঙলা পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দৈনিক 'স্বাধীনতা'র সাব-এডিটর হন। একাধারে সাংবাদিক, লেখক, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক ও সংগঠক সুধী প্রধান বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'Marxist Cultural Movement in India' (৩ খণ্ড), 'নবান্ন প্রযোজনা ও প্রভাব', 'গণ-নব-সং নাট্যগোষ্ঠী কথা,' 'সুভাষচন্দ্র ভারত ও অক্ষশক্তি' ইত্যাদি।

৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ কলকাতার ক্যাপিটল নার্সিং হোমে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। স্ত্রী শান্তি প্রধান অনেক আগে গত হয়েছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র জয়ন্ত প্রধান। একটি মাত্র মেয়ে আগেই মারা গেছেন। জামাই তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতিমান চিকিৎসক। জীবনের শেষ পর্বে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত মিনু নামে এক পরিচারিকাই তাঁর সেবা যত্ন করেছেন।
—সম্পাদক

একটি কবিতা সীমান্ত প্রকাশনা
সমর্পণ মুখোপাধ্যায়ের
ফিরে আসি কোলাহলে

● বইপত্র

□ **স্বপ্নপূরণ সিলেবাসগুলি** □ রামকিশোর ভট্টাচার্য
□ কবিতা ক্যাম্পাস □ ২০ টাকা

কবি রামকিশোর ভট্টাচার্যের সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নপূরণ সিলেবাসগুলি' হাতে পেলে যে কোনও সৌখীন মেজাজের লোকের মনটা খুশী খুশী হয়ে উঠবে। তার কারণ, এর অনবদ্য স্বাপ্নিল বর্ণময় মনকাড়া প্রচ্ছদ। বিশ্বজিৎ ঘোষকে ধন্যবাদ এরকম একটা অজটিল আকর্ষক স্নিগ্ধ সুন্দর প্রচ্ছদ শিল্পের জন্যে।

মোট পঞ্চান্নটি কবিতা নিয়ে বই, রচনাকাল ১৯৯৩-৯৬। কবি এগুলিকে আবার রচনাকালের ভিত্তিতে দুটি বিভাগে সাজিয়েছেন। প্রথম সারিতে বাইশটি (১৯৯৩-৯৫) এবং দ্বিতীয় সারিতে তেত্রিশটি (১৯৯৫-৯৬)। এই সজ্জার মধ্যে বিশেষ কি উদ্দেশ্য নিহিত, তা বোঝা গেল না।

একমাত্র 'পূর্বকথন' ছাড়া সব কবিতাই নাতিদীর্ঘ। কাব্যগ্রন্থটি পড়লে প্রথমেই প্রতীয়মান হয়, কবি মূলতঃ এক রোমান্টিক পুরুষ। তাঁর কাব্য মানসিকতার জগতে ঘনঘন আসা-যাওয়া করে বিশ্ব-প্রকৃতির যাবতীয় চেতন-অচেতন বস্তু। আকাশ, চাঁদ, মেঘ, পাখি, জোনাকি, নদী, জলপ্রপাত এমন কি গুল্মলতাও। ঘুরে-ফিরে হাজির হয় নারী-পুরুষের কথা। বিচিত্র অনুষঙ্গে অপূর্ব চিত্রকল্পে রচিত কিছু কিছু কবিতা মনকে ছুঁয়ে যায় বেশ! অন্য পক্ষে, গভীর ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিকতা বা রূপকধর্মীতার সচ্ছল প্রয়োগ সমগ্র কাব্য-গ্রন্থটিকে এমন একটি কাঠিন্য দান করেছে, যা সাধারণ পড়ুয়াদের বিকর্ষিত করতে পারে। সম্ভবতঃ কবির নিজস্ব এক পৃথিবী আছে, যা অর্গলবিহীন নয়। দৈনন্দিন জীবন-যুদ্ধের রূঢ় বাস্তবতা সঞ্জাত অবক্ষয়ী নৈতিকতার চিত্রগুলিকে কবি যেন পাশ কাটিয়েছেন।

নিটোল আধুনিক বাঙলা কবিতা হিসাবে পোস্টমর্টেম, পিয়ানো মায়ায়, প্রদোষে, ভেতরে সাজানো, রূপকথা, স্বপ্নপূরণ সিলেবাসগুলি আমর্ম নাড়া দেয়। নিরুদ্দেশ, রূপকথা, চন্দ্রদোষ শীর্ষক কবিতায় গীতিময়তার আবেশ বেশ উপভোগ্য। 'সুঁচটির কানেকানে সুতো শুধু বলে যায় / সেলাইয়ের আশ্চর্য কথা' (পোস্টমর্টেম) কিংবা 'বকের পালকে ইস্কুল ছুটির খুশি' (পালক কিংবা পোস্টকার্ড) পংক্তিগুলি কাব্যসুষমা মন্ডিত। ছায়াগান, নাচ-শব্দ, কষ্ট-নীল, ঘুম-গান প্রভৃতি যুগ্মশব্দ বিশেষ দ্যোতনাময়।

একুল শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

এতদসত্ত্বেও আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটির অতীব জনপ্রিয় হওয়ার অসুবিধা আছে। কেননা, 'অসীমকে যেখানে ধরা যায় সেখানেই ভাস্কর্য', আর অসীম যেখানে সীমাহীন সেখানে গান। ভাস্কর্যের সঙ্গে মাটির, গানের সঙ্গে আকাশের সম্পর্ক। কিন্তু কবিতার সম্পর্ক কার সাথে? কবি-জীবনের অনুরাগ-বিরাগ, সুখ-দুঃখ যখন আত্মাত্তরিত অভিব্যক্তি হয়ে রসঘন অনবদ্যতায় পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখনই হয় সার্থক কবিতা। অর্থাৎ কবিতা পাঠের পর মানুষের হৃদয়ে শুরু হওয়া চাই মোমবাতির গলন। সেই নিরীখে কবি রামকিশোর যে শতকরা একশো ভাগ সফল, তা বলা যায় না ☐ স্বর্ণকুমার পালধি

☐ জেগে ওঠে নদীর ঠিকানা ☐ মুরারী ভট্টাচার্য
বিমলারঞ্জন প্রকাশন ☐ ১৫ টাকা

আজকের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে কোন কবিই বোধহয় সময়কে তাঁর নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করার দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। একদিকে তিনি যেমন শব্দের মধ্য দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে, স্মৃতিকে, অস্তিত্বের স্তরগুলোকে খোঁজেন আবার অন্যদিকে সেগুলিরই আলোক সম্পাতে দৃশ্যমান ও অনুভূতিগম্য বাস্তবতাকে আলোকিত করে তুলে কবিতায় উজ্জীবন ঘটান।

আমাদের সামনে রয়েছে কবি মুরারী ভট্টাচার্য্যের পঞ্চম কবিতার বই 'জেগে ওঠে নদীর ঠিকানা'। কবি তাঁর চারপাশের নিয়মিত ধ্বসে যাওয়া নদীর পাড়ের মতো বিবর্ণ, রুগ্ন ও মৃতপ্রায় স্বপ্নগুলির উজ্জীবন ঘটিয়েছেন ৪৪টি কবিতার মধ্য দিয়ে। কবির ভাবনাস্তরগুলিকে চিনে নেওয়ার বিনীত চেষ্টায় কয়েকটি কবিতার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পথ চলি :

"ক্ষুধার ভেতরে স্বপ্ন বেড়ে ওঠে ধুলোয় মলিন
মুঠির ওপরে স্বপ্ন পিচ্ছিল থরো থরো কাঁপে।
রোদে জলে আশঙ্কায় অভাগীর স্বপ্ন পুড়ে ছারখার
ঝড় ওঠে মানুষের জীর্ণ হাড়ে…" (পূর্বাভাস)

এভাবেই কবির বিভিন্ন কবিতায় আধুনিক মানুষের স্বপ্ন ও তার স্বপ্নভঙ্গ বারে বারে এসেছে : "বুকের ভিতরে দেখি
বিস্ময়ন রঙীন চলচিত্র
চোখের সম্মুখে দেখি ওড়ে রাতের ভেলকি দিনের কাবাব
রঙচটা স্বপ্নের ঢেউ" (সন্তরণ)

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

"স্বপ্নের বিবর্ণ দিনরাত কেটে রাখে তুলতুলে হৃৎপিণ্ড
জীবন শুকিয়ে হাঁটে জলহীন সাগরের উত্তপ্ত তটে"

(ওকে ডেকো না)

আধুনিক জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধ, শিকড়হীনতার ছোবল এবং মরীচিকাসম শান্তির আকাঙ্খার তীব্র আবেগ কবির অনুভবে ধরা পড়েছে। কোন কোন কবিতায় শব্দের শরীর কবিতার নির্মাণে উত্তীর্ণ হয় নি কিন্তু অধিকাংশে কবিতায় কবি তার আন্তরিক উচ্চারণ বোধ ও সময়ের উন্মোচনে পাঠককে স্পর্শ করবেন। কবির 'ক্ষুদ্র জীবনে' কবিতার উদ্ধৃতিতে পাঠকের পথ চলা শেষ হোক :

"আমাকে শান্তি দাও ক্ষুদ্র জীবনে
শান্তি শুধু নারী নয়
তার চেয়েও আরও এক গভীর বিস্তার।" □ **অমল রায়**

□ **মুহ্যমান জোনাকির নেশা**—নীলাদ্রি ভৌমিক
□ **অন্য কেউ অন্য মানুষ**—অমলেন্দু বিশ্বাস
□ **সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো**—ফেরদৌস নাহার
□ **কুয়াশা কেবিন**—স্বপন রায়

নীলাদ্রি ভৌমিকের ১ ফর্মার কবিতার বই মুহ্যমান জোনাকির নেশা"। নীলাদ্রির ভিতরে কবিতা আছে। মাঝে মাঝে জোনাকির আলো জ্বলে, মাঝে মাঝে আলো নিভিয়ে দেয় কবির অস্থির চলাচল। ভালোলাগার মত কবিতা— এই যে অনির্বচনীয় মুখ ও মুখোশ / সঁতো ছিড়ে পুনর্বার খোলসের মধ্যে নির্জন হয়ে ওঠে আমি ও সমান্তরাল ছায়া / এই যে বন্ধনহীন তুমি / যে কথা বলেনি কেউ জ্যান্ত শবদেহ ঘিরে সেকথা বলবো। স্থির, পরিণত আরও অনেক লেখা লিখুক নীলাদ্রি।

'অন্য কেউ অন্য মানুষ'—অমলেন্দু বিশ্বাসের কবিতা গ্রন্থ। কথা ছিল ভাষা বদল হবে শিল্প এসে খুলে দেবে দেশ দিগন্ত। অমলেন্দু, কবি অমলেন্দু ছন্দ তার করতলগত, করতলগত তার চিত্রকল্প, নিটোল, সুন্দর সরল জীবনের মায়াময় সুষমায় ঘেরা সব কবিতা, তন্ময়, বিহ্বল সদা জাগরুক—হানিমুন : ১, কলতলার গল্প, সময় সরনি (তিন), ছোট রাস্তা, বড় রাস্তা, ফাগ পর্ব, লঙ্ঘন, এই সব কবিতা পড়তে ভাল লেগে যায় সকলের। কিছু কিছু কবিতা ('নিষেধ মানিনা আমি' 'লঙ্ঘন') বড় ফ্রেমে বাঁধা মনে হয় যেন জ্বলে ওঠার আয়োজন নেই। তুমুল ভেঙ্গে পড়ার শব্দ নেই। নীরব রক্তপাত নেই কেন ? কবি সব ফ্রেম ভেঙে ফেলে বেরিয়ে পড়ুক ! সাফল্য আসবেই।

একুশ শতাব্দী, ডিসেম্বর ১৯৯৭

গতবছর বইমেলায় ফেরদৌস নাহারের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। অগ্নি-কাণ্ডের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল দুই কবি সন্ধ্যা ভৌমিক আর ফেরদৌস নাহার। আমার জন্য রেখে যাওয়া বই—'সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো'—ঢাকা থেকে প্রকাশিত সুন্দর প্রচ্ছদ সহ ছিমছাম বইটি।

ফেরদৌস নাহারের কবিতার বই এর আগেও পড়েছি। আমার সমসাময়িক এই কবি। এই বইতে আমি অন্য এক কবিকে খুঁজে পেলাম। যে প্রকৃতই কবি হয়ে ওঠার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এত পরিণত, সুন্দর লেখা এতে আছে ভাবা যায়না। কবি যদি তার আবেগকে একটু এড়িয়ে যেতে পারত, তবে আরও উজ্জ্বল হত এই সংকলন। ব্যক্তিগত লেখাও বাদ দিতে হত বেশ কিছু। তবু ভাল কিছু লেখা এই বইয়ে রয়েছে অবশ্যই। যেমন পড়তে পড়তে ভেসে যাওয়া 'চোখ বুঁজলেই দেখতে পাই, সে যেন জলপাই বন, তার দেহে প্রাচীন বল্কল, জাপটে ধরেছে গাঢ় মায়াবী সবুজ, (খুব কড় হচ্ছে ৫)। তেমনি ছবি এক, ছবি দুই, জন্ম সফল হবে, সফল জন্ম ছবি, কে বলো ছুঁয়ে দেবে রং ভরা তুলি। ছবি ৩ আরও উজ্জ্বল—'আগুনের ফ্রেম থেকে উদ্ধার করে আলো, সবুজের গাঢ় ছবিখানি, পুড়ে যাবার যন্ত্রণায় যে দ্বীপ জ্বলছে দূরে, জলদূত এইবেলা ভিজিয়ে এসো তাকে।' এম্পৌনাট ছবি আঁকে, আলোচাষী, বৃষ্টি তিন, জারজ আত্মা আনে অসহ্য আলোক উল্লেখযোগ্য।

মাঝে মাঝে ভাবি যারা ভাষা বদলের কথা বলে, কবিতায় মেদহীনতার কথা বলে, স্পষ্ট উচ্চারণে শব্দ ছেড়ে, কেটে নেয় জুড়ে দেয়, সেই তাদের অদ্ভুত ভাষার বিন্যাস কেমন, কেমন তার রূপ। 'কুয়াশা কেবিন' স্বপন রায়ের কবিতার নির্মাণ। চেতনা ঘর খুঁজে পেয়েছেন তিনি। চেতনা কি ঘরে থাকে, না তাকে ঘরে রাখা যায়। পড়তে শুরু করি স্বপনের লেখা খুব ধীরে, মাঝে মাঝে আটকে যাই, থমকে যাই, আবার পড়ি—রূপরেখা : সারান্ডা, ঠিক জায়গায় এসে কবিকে আমি চিনতে পারছি একটু একটু। ব্রাশ-ট্যুর : তুই, হাসপাতাল, ডায়েরির ডানা : ২১.১.৯২, দুঃখ রিচিং : ছুটি, রূপরেখা : সিপলিপাল, রূপরেখা : ম্যাকলোস্কিগঞ্জ স্মৃতিমা : কাঁপ। অসম্ভব ভাললাগা কবিতা। ধূপ-শহর নামের গুচ্ছ কবিতায় শুরু রবীন্দ্রনাথের গানের এক একটি লাইন বসিয়ে। বিষয়টা তেমন ভাবে টানে না। কেবল আছে দুঃখ আছে মৃত্যু—কিছুটা ছুঁয়ে গেছে। এই ভাষা কথায় সাধারণ পাঠক তার কবি স্বত্বাকেই খুঁজে পাবে না। অথচ এই কবির মনন ও মেধা সবই আছে। যা নেই তা পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রচেষ্টা। □ **সুমিত্রা দত্তচৌধুরী**

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ২ □ সংখ্যা ৩-৪ □ ১৯৯৭

(জুলাই—ডিসেম্বর)

সম্পাদক □ সাগর বিশ্বাস

সহযোগী □ সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

উপদেষ্টা □ অমিতাভ চৌধুরী দিলীপ চক্রবর্তী

যোগাযোগ □ এন ২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১

Best wishes from

Vyaparic Pratisthan Ltd

2. Brabourn Road [5th Floor]
Calcutta-700001
Phone 225-3992

Semicon Electronics Pvt Ltd

4. Adi Banstalla Lane
(6th Floor, Room No. 2)
Calcutta-700007
Phone : 239-7434 / 7456, 232-3678
Fax : (033) 239-0320

Mfg. of basic & cordless electronics telephones / EPABX / two lines / conference and other electronic systems.

একুশ শতাব্দী

(শ্রাবণ—পৌষ ১৪০৪)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়—৮

প্রবন্ধ

নাট্যলোকের সংকট □ তুলসী লাহিড়ী ১

তুলসী লাহিড়ী □ নিতাই সেন ১৫

শতবর্ষের প্রণাম □ দেবনারায়ণ গুপ্ত ২১

একটি নিঃশব্দ শতবর্ষ □ শুভ জোয়ারদার ২৩

নাটকে তুলসী দাস □ সাগর বিশ্বাস ৩৪

তুলসী লাহিড়ীর শিল্পকর্ম (সংকলন) ৩৮

গল্প

হেলিকপ্টার, চটের বস্তা এবং গুপি □ মৃদুল কান্তি দে ৩৯

কবিতা

ডি. জে. ইনরাইট / আবু হাসান শাহরিয়ার ৪৫

□ ব্রাত্য রাইসু ৪৬ □ প্রমোদ বসু ৪৭ □ তীর্থঙ্কর মৈত্র ৪৭ □ নন্দদুলাল ভট্টাচার্য ৪৮ □ মধু গোস্বামী ৪৯ □ ব্রত চক্রবর্তী ৫০ □ তাপস রায় ৫০ □ কৃষ্ণা বসু ৫১ □ অনুরাধা মহাপাত্র ৫১ □ সুমিত্রা দস্তচৌধুরী ৫২ □ □ সমর্পণ মুখোপাধ্যায় ৫৩ □ সোমক দাস ৫৩ □ তিলোত্তমা বসু ৫৪ □ চন্দ্রিকা বিশ্বাস ৫৫ □ কিংশুক রায় ৫৬ □ সন্ধ্যা ভৌমিক ৫৭

স্মরণের আবরণে

সুধী প্রধান □ কল্পতরু সেনগুপ্ত ৫৮

বইপত্র

স্বপ্নপূরণ সিলেবাসগুলি / স্বর্ণকুমার পালধি ৬১ □ জেগে ওঠে নদীর ঠিকানা / অমল রায় ৬২ □ মুহ্যমান জোনাকির নেশা / অন্য কেউ অন্য মানুষ / সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো / কুয়াশা কেবিন / সুমিত্রা দস্তচৌধুরী ৬৩

প্রচ্ছদ

এষা বিশ্বাস

With best wishes from

Excel Drug House

16-B, Sukeas Lane
Calcutta-700001
242-8571

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের

জনকল্যাণ প্রকল্প

- ☐ দাতব্য চিকিৎসালয় (অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি)
- ☐ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ☐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- ☐ কুটির শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থান
- ☐ প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণ

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ

দক্ষিণ কোদালিয়া, নবব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ ঠাকুর সমীর ব্রহ্মচারী

শিশু শিক্ষার বিশ্বস্ত বিদ্যালয়

নব শিশু নিকেতন

বিশরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
প্রধান শিক্ষক ঃ বাদলচন্দ্র গুড়িয়া

সাহিত্য বিহার-এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ॥ বড়দিদি ৮·০০ ॥ পরিণীতা ৮·০০ ॥ চন্দ্রনাথ ৯·০০ ॥ পল্লী-সমাজ ১৩·০০ ॥ বিরাজ বৌ ১২·০০ ॥ অরক্ষণীয়া ৮·০০ ॥ বামুনের মেয়ে ১০·০০ ॥ গৃহদাহ ১৮·০০ ॥ গল্পসংকলন ১৮·০০ ॥ নিষ্কৃতি ৮·০০ ॥ স্বামী ৮·০০ ॥ পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ॥ ননবিধান ৮·০০ ॥ বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ॥ দেনা-পাওনা ১৫·০০ ॥ রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ॥ কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ॥ মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ॥ দত্তা ১৫·০০ ॥ চরিত্রহীন ২০·০০ ॥ পথের দাবী ১৮·০০ ॥ কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ॥ প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮·০০ ॥ নাটক—ষোড়শী ১০·০০ ॥ বিজয়া ১০·০০ রমা ৯·০০ ॥

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ॥ পথের দাবী ২০·০০ ॥ চরিত্রহীন ২২·০০ দেনা-পাওনা ১৮·০০ ॥ শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ॥

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ॥ সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ॥

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন : ৩৫০-৯৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

Das Construction and Hardware

General order suppliers

All kinds of building materials and hardware goods

Bisharpara—24 Parganas [N]

Prop : Aloke Das

Contact :— Ph : 247-0020

Pioneer Airconditioning Co.

22/2, Karava Road
Park Circus
Calcutta—700017

(For any airconditioning & refrigeration works)

Modern Sanitary & Hardware Stores

Govt. authorised non-levy cement dealer &
supplier of building materials
M. A. Sarani, Bankra, Calcutta-51

&

Modern Decorators
175/1, A.P.C. Roy Road, Birati, Calcutta—51
Phone : 512-2159, 512-2520

একুশ শতাব্দী

- তিনমাস অন্তর বেরোয় (জানুয়ারি—মার্চ, এপ্রিল—জুন, জুলাই—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—ডিসেম্বর)
- গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক তিরিশ টাকা। ডাকযোগে পঞ্চাশ টাকা। জানুয়ারী থেকে গ্রাহক করা হয়।
- লেখকেরা অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবেন। সঙ্গে পুরো ঠিকানা দেবেন।

With best compliments from

Eastern Monochem (P) Ltd

Manufacturer of various chlorinated Products

Office : L-10, Nabadarsha Society
Calcutta-700051
Phone : 512-4326

L, C. Concern

(Specialized in Survey & Soil Testing)

Topography, Engineering, Hydrography, Route, Land, Quantity & Civil Works

7, C. R. Avenue, (Top Floor) Calcutta-700072
P.O. Box No. 556, Calcutta 700001
Ph. 26 2321 ● Fax : 013-2486871 ● Gram : Minhardale

With best wishes from

A Well Wisher

R. Krishnan

● সম্পাদকীয়

এ বছর বাঙলা রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য শিল্পী তুলসীদাস লাহিড়ীর জন্মশতবর্ষ পূর্তির বছর। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর মতো একজন প্রকৃত শিল্পীর যথার্থ মূল্যায়ণ আজও হয়ে ওঠেনি। এই শত বার্ষিকীতেও কি সরকারী কি বেসরকারী কোন স্তরেই তুলসী লাহিড়ীকে বিশদভাবে জানার বা জানানোর তেমন কোন আগ্রহ অথবা কর্মতৎপরতার খবর আমাদের জানা নেই। প্রয়াত সুধী প্রধানের সভানেতৃত্বে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একটি কমিটি সম্ভবত বছরের গোড়ার দিকেই গঠিত হয়েছিল যার মধ্যে দেবনারায়ণ গুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা বিভাস চক্রবর্তীর মতো নাট্য-ব্যক্তিত্বের নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য যে কমিটির কোন কর্মসূচীর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে নেই।

আমরা যারা চল্লিশের দশকে অবিভক্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি তাদের পক্ষে এই মহান শিল্পীর কাজ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ছিলনা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চাঞ্চল্য ও সে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দোচ্ছ্বাস সমকালীন অনেক ইতিহাসকেই তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তুলসী লাহিড়ী এই ভেসে যাওয়া ইতিহাসেরই দুর্লভ সামগ্রী। 'একুশ শতাব্দী' তার সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে বঙ্গ সংস্কৃতির সেই বিস্মৃত শিল্পীকে আজ পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে।

সমসাময়িক নাট্যব্যক্তিত্ব যাঁরা তাঁর গাঢ় সান্নিধ্যে ছিলেন, কেউই প্রায় বেঁচে নেই। অল্প দু'চারজন যাঁরা আছেন তাঁদেরও স্মৃতির পাতা ধূসর হয়ে এসেছে। গুরুতর অসুস্থ দেবনারায়ণবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়েও যে আন্তরিকতায় স্মৃতিচারণ করেছেন তা আমাদের এক দুর্লভ প্রাপ্তি। উপরোক্ত শতবর্ষ কমিটির সম্পাদক শুভ জোয়ারদার বিস্মৃতপ্রায় শিল্পীর উপর অনেকটাই আলোকপাত করেছেন। অতীতের দুটি লেখা আমরা পুনর্মুদ্রণ করেছি। একটি স্বয়ং তুলসী লাহিড়ীর, অন্যটি তাঁর মৃত্যুর পরে নিতাই সেনের লেখা যা 'অভ্রান্ত' বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। এ সবের মধ্য দিয়ে এই প্রজন্মের পাঠক অখণ্ডিত ও পরে বিখণ্ডিত বাঙলার সেই আপোশহীন অভিমানী শিল্পীর একটা সাধারণ রূপরেখা পেয়ে যাবেন আশা করা যায়। সম্প্রতি প্রয়াত সুধী প্রধানের দীর্ঘ ও শেষ সাক্ষাৎকার সহ সংগৃহীত আরও কিছু তথ্য স্থানাভাবে সন্নিবেশ করা গেলনা। এজন্য দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া কীই বা করতে পারি আমরা? ছোট পত্রিকার বড় সাধ আর গরীবের ঘোড়া রোগ সম্ভবত সমার্থবোধক। []

উত্তর ২৪-পরগণা জেলার সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর এবং প্রবহমানশিক্ষা কর্মসূচীর রূপরেখা—একনজরে :

- ☐ মোট লোকসংখ্যা — ৭৩ লক্ষ। [বিগত আদমসুমারী মতে]
- ☐ ৫টি মহকুমা, ২২টি পঞ্চায়েত সমিতি, ২০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত।
- ☐ ২৭টি পৌরসভা — ওয়ার্ডের সংখ্যা ৭৪২।
- ☐ ১টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা।

১৯৯১, ৮ই সেপ্টেম্বর জেলার সাক্ষরতা কর্মসূচীর সূচনা

- ☐ মোট নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ১০.০৫ লক্ষ। [৯ থেকে ৫০বছর বয়স পর্যন্ত]
- ☐ সাক্ষরতা কর্মসূচীতে এ পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছেন ৮লক্ষ ৬৩হাজার
- ☐ সাক্ষরোত্তর পর্যায়ের মূল্যায়নে সফল পড়ুয়ার সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৯৩। সাক্ষরোত্তর পর্বের এইসব সফল পড়ুয়াদের একাংশকে ইতঃমধ্যেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে স্বনির্ভর করা গেছে।
- ☐ যারা ধারাবাহিকভাবে এই কাজ রূপায়ণ করেছেন সেইসব কে. পি. এম.টি.ভি.টি. ও ভি.এস. দের সংখ্যা আনুমানিক ১লক্ষ ৯ হাজার!
- ☐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে আনন্দের সাথে শিক্ষাদান কর্মসূচী 'আনন্দ পাঠ' পশ্চিমবঙ্গেরমধ্যে সর্বপ্রথম এই জেলায় শুরু হয়েছে।
- ☐ 'ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স ইউনিট' [ডি. আর. ইউ] জেলায় কাজ শুরু করেছে!
- ☐ সাক্ষরতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য কর্মসূচী জনস্বাস্থ্য, চেতনা বৃদ্ধি. মাতৃমঙ্গল শিশুমঙ্গল কর্মসূচীতে এই জেলা সারা রাজ্যে ১৫/১৬তম স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে উন্নীত হতে পেরেছে।
- ☐ সাক্ষরতা আন্দোলনে জেলার সকল গ্রন্থাগারকেও যুক্ত করা হয়েছে।
- ☐ ৪০টি "শিশুশ্রমিক কল্যাণ" বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে।
- ☐ সাক্ষরোত্তর পর্বের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে আমাদের জেলা এক নতুন পর্যায়ে—"ধারাবাহিক শিক্ষা" কার্যক্রমে প্রবেশ করতে চলেছে। জে ায় এই ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রের [সি. ই. এ সংখ্যা হবে প্রায় ২ হাজার ২ শত ৪০টি।
- ☐ জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনের এই নব পর্যায়ে এবং এর আগামী সাফল্যের জন্য, জেলার সকল মতের, সকল পথের মানুষজন, সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র-যুব ও সাংস্কৃতিক জগতের সৃজনশীল মানুষদের আশীর্বাদ, সহমর্মিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের একান্ত কাম্য।

উত্তর ২৪-পরগণা জেলা সাক্ষরতা সমিতি : বারাসাত

EKUSH SHATABDI

(a distinctive bengali periodical ☐ DL No. 4/96
Vol. 2 ☐ No. 3-4 July—December 1997 ☐ Rs. 10

একুশ শতাব্দী

পরবর্তী সংখ্যা

শতবর্ষে তারাশঙ্কর

লিখছেন

উৎপল কুমার মজুমদার, অলোক রায়, তারাপদ আচার্য, ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, সরোজমোহন মিত্র, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মোমিন (ঢাকা) সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় দাশগুপ্ত প্রমুখ।

গ্রাহক, বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ
যোগাযোগ করুন
একুশ শতাব্দী
এ ২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১

ডালিয়া রায় (সত্ত্বাধিকারী) কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১, রাজা রামমোহন রায় সরণি কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এ-২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক—সাগর বিশ্বাস